সমীপেষু'র গল্প

সম্পাদনায়

সত্যব্রত সেন

প্রাপ্তিস্থান

প্রভা প্রকাশনী

আবাহনী
১১, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা—৯

প্রকাশিকা :
শ্রীমতি চন্দ্রিমা মণ্ডল
অর্পিতা প্রকাশনী
বি-৬/১৭৫, কল্যাণী
নদীয়া

ব্যবস্থাপক :
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল

পরিবেশক :
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া, নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর, উঃ ২৪ পরগনা

প্রকাশ : ১৯৬৩

প্রচ্ছদ : রতন মুখার্জী

মুদ্রাকর :
অজিত দাস-ঘোষ
বাসন্তী প্রেস
৩৭, বিডন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

এতে যা আছে

ছায়াঘেরা পথ

ভবানী মুখোপাধ্যায়

এ গল্প আমার বন্ধু জয়দেব চক্রবর্তীর গল্প, সাহসী লোক জয়দেব, আর খুব বেশী মিথ্যাবাদী নয়,—মানে আর পাঁচজনের চাইতে বেশী নয়। অবশ্য জয়দেবের এমন ভয় পাওয়া উচিত নয়, একটু রাত হলে সে কিছুতেই ঝাউতলা রোড মাড়াবে না। আপনি তিরস্কার করবেন, ঠাট্টা করবেন, তবুও বোকার মত হাসবে। ঝাউতলা রোড মরে গেলেও যাবে না। বেকবাগানের মোড় থেকেই বেঁকতে চাইবে।

আপনি হয়ত তাকে প্রশ্ন করবেন কিসের এত ভয়, তখন নির্লজ্জের মতো হেসে জয়দেব বলবে, ঝাউতলার রাস্তায় গেলেই নাকি সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। একথায় আপনার সহিষ্ণুতার সীমা পার হয়ে যাবে, অবিশ্বাস ও বিরক্তি মনে জাগবে, কিন্তু আর কোন স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে ত' জয়দেবের কপালে ঘাম দেখা যায় না, এমন লজ্জা কুণ্ঠিত ভদ্রভাব দেখা যায় না—তবে? আপনি হয়ত জয়দেবকে বিদ্রূপ করবেন, শ্লেষ করবেন, ভুলে যাবেন যে জয়দেব একটু রগচটা—কিন্তু কিছুতেই ভেবে পাবেন না যে, কেন জয়দেব চক্রবর্তী, বালিগঞ্জ থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত কোন মেয়ে সম্পর্কেই কোন সত্য বা মিথ্যা কথা অবলীলাক্রমে বলে যেতে যার আটকায় না, সে কেন ঝাউতলা মোড়ে মেয়ের কথা উঠলে এমন মিইয়ে যায়, এত কুণ্ঠিত হয়। অনেক অনুনয় বিনয়ের পরেও জয়দেব হয়ত বলবে না।

আজকালকার দিনে সব পথ সুগম হয়ে গেছে। বাস, ট্রাম, ধারি ট্যাক্সি, বেবী ট্যাক্সি—সুতরাং ঝাউতলা রোড কি এমন দুর্গম পথ, এই ত' পার্ক সার্কাসের ট্রাম ডিপো পার হলেই ঝাউতলা—এদিকে আমীর আলী এভিন্যু, ওদিকে ঝাউতলা, তবু এত ভয়। পথটা

সরু বটে, রাস্তার দুপাশে দুটি বিরাট প্রাসাদ, একটা নাকি নূরনগরের রাজাদের, ওপাশেরটা ছিল হরিণঘাটার দেববাহাদুরদের। ইদানিং কিনেছে পদমরাজ সোয়াইকা—এককালে এই অঞ্চলে আভিজাত্য ছিল—পুরাতন বালীগঞ্জ কলকাতার কালচারের প্রধান পীঠস্থান একদা এই নির্জন অঞ্চলে কত মহাজনের পদধুলি পড়েছে, এখন আর অবশ্য সেদিন নেই। নূরনগরের বাড়ী অন্ধকার, শিগ্‌গীরই নাকি বিক্রী করা হবে, হাইকোর্ট থেকে নীলামের ব্যবস্থা হচ্ছে। তবু যেন একটা সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়া আছে এই অঞ্চলের।

যুদ্ধের পর বছর খানেক মাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পৃথিবী আবার নির্ভয়ে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করছে। জয়দেব চক্রবর্তী পাম এভিন্যুতে সহায়রাম সরকারের বাড়ী থেকে তাস খেলে ফিরছিল, সর্টকাট হবে তাই ঝাউতলার রাস্তা ধরেছিল, আসছে পার্ক সার্কাস ডিপোর দিকে। রাত অনেক হয়েছে, কৃষ্ণপক্ষের হিমেল রাত। নিস্তব্ধ নির্জ্জন পথ—বেওয়ারিশ কুকুর আর ঝি-ঝি পোকা ডাকছে—জয়দেব ভাবছে এত রাতে যদি ট্যাক্সি না পাই তবে সেই সারকুলার রোড পর্যন্ত হাঁটতে হবে, মনে মনে অনুশোচনা হচ্ছে এত গভীর রাত করা উচিত হয়নি। একটা সিগারেট ধরিয়ে অতি ধীরে ধীরে হাঁটছে জয়দেব—কত কি ভাবছে—তাস খেলার সময় যেমন কিছুই স্মরণে ছিল না—এখন তেমনই পৃথিবীর চিন্তা মাথায় এসেছে, নিজের পায়ের শব্দে নিজেই মাঝে মাঝে চমকে উঠছে। এমন সময় মনে হয় ওর সঙ্গে আরো একজন যেন পথ চলছে—ওর মতো ধীর পদক্ষেপে কিছু আগেই চলেছেন কিছু মাঝে মাঝে থামছেন—নিশ্চয়ই রাতচরা স্ত্রীলোক, শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছে। জয়দেব চক্রবর্তী তাকে অতিক্রম করে চললো। বিশেষ আগ্রহ নেই তার মুখ দেখার; এক পা—দু'পা—হঠাৎ মনে হল কি যেন বলল মেয়েটি। অতি কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর। জয়দেব সে কথায় কান দেয় না—কিন্তু আবার সেই কাতর কণ্ঠ। ঘুরে দাঁড়াল জয়দেব, অবশ্য তেমন প্রসন্ন মনে নয়।

রাতচরা মেয়েরা পথচলা মানুষকে প্রলুব্ধ করার জন্য যে সব কথা

বলে তা অতি সংক্ষিপ্ত, বক্তব্য স্পষ্ট, অতীতে জয়দেবের কানেও এমন অনেক কথা ভেসে এসেছে কিন্তু কোনদিন এমন চমকে দাঁড়ায়নি, কারণ এ ধরণের প্রেমলীলা ওর রুচিতে বাধে। কিন্তু কি আশ্চর্য! এই স্ত্রীলোকটা যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে, এমন কিছু ইঙ্গিত সেই কণ্ঠে নেই, অথচ ভদ্র মহিলাজনোচিত কোমল কণ্ঠস্বর, কোন প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না, আছে মিনতিভরা আবেদন। জয়দেবের কানে সেই করুণ সুর পৌঁছালো—'দেখুন'।—বলে কি 'দেখুন'! ঘুরে দাঁড়ালো জয়দেব।

'বলুন'—জয়দেব বলে ওঠে, কণ্ঠস্বরে একটু কোমলতা নেই। তবু, অতিশয় ভদ্র এবং বিনীত ভঙ্গীতে জয়দেব বলল—'বলুন'।

লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে এল মেয়েটি, জয়দেবের কাছে এসে দাঁড়ালো, মাথায় ছোট, কৃশ তনু, জয়দেবের বিশাল দীর্ঘ দেহের সামনে যেন শিশু—বয়স বেশী নয়, কমও নয়, আকৃতি মাঝারী ধরণের। পোষাক পরিচ্ছদও সেই রকম। ভব্য, ভদ্র ভঙ্গী—হাতে একটা ছোট্ট ব্যাগ আছে, ভ্যানিটী ব্যাগের চাইতে আকারে কিছু বড়। মেয়েটি মৃদু হাসলো জয়দেবের মুখের পানে তাকিয়ে।

জয়দেব বলল—'বলুন'।

মহিলাটি বল্লে: অনুরোধ অতি সামান্য—এই রাস্তাটা পার হতে আমার ভয় করে। আপনি যদি বেগবাগানের মোড় পর্যন্ত সঙ্গে থাকেন তো ভালো হয়।

গলার আওয়াজ শান্ত এবং ভদ্রজনিত।

সবিনয়ে জয়দেব বলল—'বেশত'। সঙ্গে রইল জয়দেব, কিন্তু মহিলাটি আগের মতই ধীরে ধীরে হাঁটছেন, ফলে জয়দেবের পদক্ষেপও মন্থর করতে হল।

হঠাৎ কি মনে হওয়ায় জয়দেব প্রশ্ন করল—'এতই যদি আপনার ভয়, এই নির্জনে আমার মত অপরিচিতকে আপনার ভয় নেই।'

মহিলাটির মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল—

'আপনার মুখ আমি অনেক আগেই লক্ষ্য করেছি, ড্রয়িংরুমের

মহিলাদের কাছে আপনি হয়ত বিপজ্জনক, এই ঝাউতলা রোডে আপনি শক্তিহীন, দুর্বল। অন্তত আমার পরিচিতদের মত নয়...

অতি আস্তে এরা পথ চলছে, তখনও অর্ধেক পথ বাকী, তবু জয়দেব বলল না, একটু তাড়াতাড়ি হাঁটুন। মহিলাটির করুণ অবস্থায় এতক্ষণে তার মনে কিঞ্চিৎ দয়া হয়েছে। নিছক সৌজন্যের খাতিরে সে প্রশ্ন করে—

'আপনার কি কোন বিপদ ঘটেছে? মানে কেউ বা কারা আপনার পেছু নিয়েছে?'

কোমল গলায় মেয়েটি বলল, "কারা নয়, শুধু কেউ একজনকে আমার বড় ভয়।"

জয়দেব যেমন লম্বা, মেয়েটি তেমনি মাথায় ছোট—মনে হচ্ছে যেন হাঁটুর কাছ থেকে কথা আসছে। মেয়েটি আবার বলল—'একজনকেই আমার ভয়, তাইতে একা রাতের বেলা পথ চলতে ভয় করে। অনেক দিনের ঘটনা। তবু আমার সব আজো মনে আছে।'

'তাহলে নিশ্চয়ই আপনাকে রীতিমত ভয় পাইয়ে দিয়েছিল দেখছি।"—কৌতূহল না থাকলেও জয়দেব বলে ওঠে।

মহিলাটি নম্রকণ্ঠে বলল—"ঠিক তা নয়—তবে আমার জীবনে সে এক স্মরণীয় ঘটনা। আমার প্রতি রাতে অন্ততঃ দশ টাকা পাওয়া দরকার। গোটা ছয়েক টাকা হয়েছিল, আরো চার টাকা পাইনি। চাইতে সাহস হয়নি। তবু অনেকে অনুগ্রহ করে দু-এক টাকা বেশী দিতেন। যে রাতে আমার দশ টাকা চাই, তার পরদিনই ঘর ভাড়া দিতে হবে। কদিন ধরে কেবল সময় দিয়েছি···

কোমল গলায় মেয়েটি বলেই চলেছে। তার আত্ম পরিচয় ও পাওয়া গেল। সব কথা মন দিয়ে শুনছেও না জয়দেব; ভাবছে এই অঞ্চলে তার দু-এক ঘর আত্মীয় কুটম্বও আছে, দৈবাৎ এই সময়ে এইভাবে দেখলে কেউ কি আর ভালো ভাববে? প্রায় বেকবাগানের মোড়ে এসে পড়েছে। কণ্ঠস্বর আরো দ্রুত হয়ে এলো মনে হচ্ছে জয়দেবের।

"ঠিক যেখানটায় আপনার সঙ্গে দেখা হল, ঐখানেই তার সঙ্গেও দেখা হয়েছিল, ঐ মোড়টাতেই। লোকটা মোটেই ভদ্র নয়, কিন্তু আমার টাকার প্রয়োজন—আজকের দিনে কার পকেটে টাকা আছে আর কার পকেটে নেই বলা যায় কিনা বলুন না? কিন্তু লোকটা কথার জবাবে আমার মুখের পানে তাকিয়ে দেখতেই বুঝলাম আমি ভুল করেছি। তবু অভদ্রতা করার মানে হয় না, তাই তার সঙ্গেই চলতে থাকি। সেদিন ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, সন্ধ্যার পর বৃষ্টি থেমেছে। শীতটাও বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। তাই সেই বিষয়েই কিছু কথা হল। যদিও ওর মুখের দিকে আমি তাকাইনি তবু বেশ বুঝলাম আমার দিকে আড়চোখে বেশ তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করেছেন উনি। বোকামী করেছি, এখন আর উপায় নেই। কিন্তু এখন ভাবতে লাগলাম ও চারটে টাকা না পেলেই ভালো হ'ত, বা কেউ যদি এ সময় এসে পড়ে তো ভালো হয়—অত রাতে অবশ্য সেরকম কিছু ঘটা খুবই অসম্ভব। এপথে পাহারাওয়ালার দেখা মেলে না। তাই বেশ তাড়াতাড়ি এই বেকবাগানের দিকেই এগিয়ে চললাম। লোকটা বোধ হয় বুঝেছিল, তাই তাড়াতাড়ি আমার সে হাতটা চেপে ধরল, আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভয়ে ওর মুখের দিকে তাকাইনি। লোকটা বললে—'চুড়ি দুগাছা সোনার, না মেকী? যাই হোক খুলে দাও, আর টাকা-কড়ি কি আছে দাও।'

তারপর একরকম জোর করে চুড়ি দুগাছা খুলে নিল, গলায় ছিল নকল পাথরের হার, সেটা নেয়নি, হাতের ব্যাগটাও ছিনিয়ে নিল। আমি আঁকড়ে ধরেছিলাম, বললাম, কিছু নেই ওতে, আছে শুধু রুমাল।

লোকটা বললে—'টাকাগুলি দাও, আমি তোমাকে একটু নেশার জিনিস দেব।'

নেশার জিনিস মানে কোকেন। তখন ওসবের খুব চল ছিল। এই বলে লোকটা সত্যি নিজের পকেটে হাত দিল।

আমি বললাম—'আমাকে ছেড়ে দাও, নইলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবো।'

কি ভেবে লোকটা আমায় ছেড়ে দিল, আর আমিও সোজা ঐ বেকবাগানের মোড়ের দিকে দৌড়ালাম। এমন জোরে দৌড়েছি যে নিজের নিঃশ্বাস ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাইনি। কিন্তু লোকটা সোজা আমার পিছনে এসেছে। ঠিক এইখানে। তারপর পিছন থেকে আমার মুখটা চেপে ধরেছে। আর কিছু মনে নেই, শুধু মনে আছে পিঠে এক অসহ্য যন্ত্রণা। লোকে কথায় বলে ছুরির মত ধার—সেইদিন বুঝলাম ছুরির ধার কত তীক্ষ্ণ—কি জানি আর কিছু মনে নেই, শুধু কোথায় ঘড়ি বেজেছিল একবার মাত্র শুনেছিলাম। বাকীটা শুনতে পাইনি। নিশ্চয় যেন ছুটো বেজেছিল। কোনোদিন ভাবিনি মৃত্যু এত সহজ, এত আকস্মিক।

এরপর জয়দেব চক্রবর্তী ভয়ে ভয়ে মেয়েটির দিকে তাকালো, কোথায় মেয়ে—ওদিকে চৌধুরীদের বাড়ীর উঁচু পাঁচিল, এদিকে নির্জন রাজপথ। কেউ কোথাও নেই। বেকবাগানের মোড়ে পৌঁছতেই জয়দেব শুনতে পেলো ট্রাম ডিপোর ঘড়িতে ছুটো বাজল।

সেই নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে ক্ষণিক প্রাণ-স্পন্দন জাগিয়ে সেই ধ্বনি অনেকক্ষণ ধরে অনুরণিত হতে লাগল।

সেই থেকে জয়দেবকে আর ওপথে কেও নিয়ে যেতে পারেনি।

মধ্যদিনের জানালা

কৃষ্ণ ধর

দিব্যজ্যোতি প্রথম আর্বানিটির সুচিক্কণ পরিবেশে প্রবেশ করল। অঞ্জনপুর থেকে কলকাতায়। গ্রামের অঞ্জনলাগা চোখে কলকাতাকে দেখল দিব্য। আজকের কলকাতা নয়। ক্রুদ্ধ জেনারেশনের কালিমা তখনও স্পর্শ করেনি কলকাতাকে। কলকাতা তখন বিদ্রোহী বাংলার প্রাণকেন্দ্র। বাতাসে বারুদের গন্ধ। চলচ্চিত্রের মতো বাংলাদেশের আর একটা ছবি ভেসে উঠল দিব্যর মুগ্ধদৃষ্টিতে। অঞ্জনপুরের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখল দিব্য কলকাতাকে। সেকেণ্ড সিটি ইন দি ব্রিটিশ এম্পায়ার। সুরমা মেখে তখন কলকাতা আসতে হত। রাত একটায় মেল আসত অঞ্জনপুর স্টেশনে। মেহেদী গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা লাল সুরকি বিছানো ছোট্ট স্টেশন অঞ্জনপুর। শীতের রাত। সুরমা মেলের যাত্রী আট দশ জন। বাবা লণ্ঠন হাতে পৌঁছে দিতে এলেন দিব্যকে স্টেশনে। কলেজে পড়তে আসছে দিব্য কলকাতায়, ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়ে। প্রথমে তিনি ইতস্ততঃ করেছিলেন ছেলেকে এত দূরে পাঠাতে। দিব্য জোর করেছিল। অবিনাশ চট্টোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিলেন।

দিব্যর মন উৎসুক হয়ে রইল কলকাতার জন্য। রাত্রির ট্রেনে আসতে আসতে তার মনে হয়েছিল এক অন্য জগতে চলেছে সে। অবিনাশ চাটুজ্জে লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন স্টেশনের প্লাটফর্মে।

ট্রেনে উঠবার সময় প্রণাম করল দিব্য।

মাথায় চুম্বন করে বাবা বললেন, সাবধানে থেকো। কলকাতা বড় ভীষণ জায়গা।

জানালা দিয়ে দিব্য তাকিয়ে রইল। লণ্ঠনের আলো কাঁপছে, কাঁপছে অন্ধকারের বুক চিরে। দিব্য অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। কান্না

পেতে লাগল দিব্যর। অঞ্জনপুরের মাটির জন্য, পথঘাটগুলির জন্য, তার আঠার বছরের স্মৃতির জন্য। চোখ ঝাপসা হয়ে এল দিব্যর। অবিনাশ চাটুজ্জে মোক্তারের ছেলে দিব্যজ্যোতি ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারসিপের ওপর ভরসা করে কলকাতা যাচ্ছে কলেজে পড়তে।

বৃদ্ধ পিতা শীতের রাত্রিতে লণ্ঠন কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বিদায় দিচ্ছে মাতৃহারা সন্তানকে।

'কলকাতা বড় ভীষণ জায়গা। সাবধানে থেকো।'

ঘুরে ঘুরে দিব্যর মনে কথাগুলো পাক খেতে লাগল।

দিব্য জানে বাবা ওর মায়ের মতো। একা একা বাড়ী ফিরে যাবেন। হাত পা ধোবেন। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত জেগে মহাভারত পড়বেন। ঠাকুরমা বিন্দুবাসিনী পড়ার আওয়াজ শুনে জেগে উঠবেন। ডাক দেবেন।

—অবিনাশ।

বাবা উত্তর দেবেন, মা।

—খোকাকে তুলে দিয়ে এলি বাবা!

বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর কাঁপা কাঁপা।

—হ্যাঁ মা! বাবা বলবেন।

বিন্দুবাসিনী উঠে বসবেন। হামনদিস্তাটি তক্তাপোষের তলা থেকে বের করবেন। পান আর সুপারী গুড়ো করতে থাকবেন। আওয়াজ হবে ঠম্‌ঠম্। ভোলা কুকুরটা চণ্ডীমণ্ডপের কোণে ঘুমুচ্ছিল। এই সময়টায় সেও জেগে উঠবে। ডাক দেবে, ঘেউ ঘেউ।

তারপর ধীরে ধীরে আবার ঘুম জড়িয়ে আসবে চোখ।

কী সব ভাবছে দিব্য। কেবলি কান্না পাচ্ছে কেন? দিব্য অন্ধকারে বাইরের দিকে তাকাল।

অন্যান্য যাত্রীরা বসে ঢুলছে। কেউ বা এরি মধ্যে শোবার চেষ্টা করছে।

বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। পৃথিবী দৌড়ুছে। চরাচর দৌড়চ্ছে উর্ধশ্বাসে। কলকাতা আর কতদূর?

জানালার ধার ঘেঁষে বসে দিব্যর মনে এই প্রশ্ন কৌতূহলী হয়ে ঘুরতে লাগল। আজও স্পষ্ট মনে আছে সেই দিনটির কথা। কতদিন পার হয়েছে। কত যুগ। ভাবতে দিব্যর কষ্ট হয়। পৃথিবী বদলেছে, বদলে গেছে তার মানুষগুলো। দিব্যই কি বদলায়নি। সেই চেহারা নেই। অমন সুন্দর চুল ছিল তার। পাতলা হয়ে টাকের চিহ্ন দেখা দিয়েছে। কিছুই থাকে না। মন শুধু বুড়োতে চায় না। শরীর বুড়িয়ে যায় কত তাড়াতাড়ি। মন সেই কিশোর জীবনের স্মৃতি পালন করে থাকতে চায়। রাণীদি বলতেন, দিব্য তুই কি চিরকাল পিটার প্যান হয়ে থাকতে চাস্? বয়স টয়স হবে না, চুল পাকবে না।

দিব্য অবিশ্বাসের হাসি হাসতো। কলকাতায় এসে রাণীদির বাড়ীতেই থেকেছিল দিব্য এক বছর। পরের বছর হোস্টেলে সিট পেয়ে অগিলভিতে উঠে গিয়েছিল। কিন্তু রাণীদিই ওর সঙ্গী ছিল এই শহরে, প্রবাসে।

প্রবাসে। দিব্য এখন ভেবে হাসল।

কোনোদিন কলকাতায় ছিল না, কলকাতায় জন্মায়নি একথা দিব্য মনেই করতে পারে না। কিন্তু সেদিন পারত। রাণীদিই দিব্যকে কলকাতার সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছিল। এই জনসমুদ্রে রাণীদিকেই সবুজ দ্বীপ মনে হয়েছিল দিব্যর। কুড়ি বছর আগে।

সেদিন একটা ছবির শিরোনামা পড়ছিল দিব্য। নো ম্যান ইজ এ্যান আইল্যাণ্ড। কথাটা কি ঠিক? দিব্যর মনে হয় প্রত্যেক মানুষই এক একটা দ্বীপ। জীবনের তরঙ্গ এসে তটে লাগছে, আছাড় খাচ্ছে। ওই দ্বীপটুকুকে ডুবিয়ে দিতে পারছে না। একাকার করে দিতে পারছে না। মাঝখানে সেই অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র। বিরহে, কান্নায় অশ্রুতে ফেনিল। তার শুভ্রপুঞ্জে সূর্যের কিরণ পড়ে চিক চিক করছে। কেউ কাউকে ছুঁতে পারছে না।

বড় ভীষণ যুগে জন্মেছি আমরা। দিস ইজ ক্রাশিং এজ্। সবচেয়ে উত্তম সময়, সবচেয়ে সর্বনাশা সময়। অক্সনিয়ান উচ্চারণে এসব কথা বলতেন অধ্যাপক বসু। দিব্য হাঁ করে শুনতো। বুঝতো আর কতটুকু।

অধ্যাপক বসুকে সবাই বলত পাগল। অদ্ভুত সব পোষাক পরে আসতেন কলেজে। কোনোদিন চোস্ত পাজমা আর বোতাম খোলা পাঞ্জাবী, অস্ট্রাখান ক্যাপ। কোনোদিন ধুতি, সার্ট। কখনও বা পুরাদস্তুর সাহেবী পোষাক। খ্রীষ্টান ছিলেন তিনি। কিন্তু ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাতেন না।

লউ গিভ আস্ দিস্ ডে, আওয়ার ডেইলী ব্রেড।

প্রার্থনা সভায় তিনি বাইবেল থেকে পাঠ করতেন।

প্রার্থনা করতে হ'ত। মিশনারী কলেজের নিয়ম। দিব্য প্রথম যেদিন কলেজে ভর্তি হ'তে গেল, সেদিন অবাক হয়ে দেখেছিল ধূসর গৈরিক রঙের বাড়িটাকে। পাশে লন। সবুজ ঘাসে ঢাকা। মস্ত একটা ইউক্যালিপ্টাস গাছ বাতাসে হাহাকার করছিল।

বৃটিশ কলেজের ক্যাম্পাস ধরণের তৈরী। ঢুকেই প্রার্থনার হল ঘর। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবি।

দিব্য থমকে দাঁড়াল। কোথায় যেন এই মুখখানি সে দেখেছে। কাঁটার মুকুট মাথায় পরে রক্তাক্ত একটি মানুষ প্রতীক হয়ে রইলেন।

তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করলে পিতা?

দিব্যর কেবলি ইন্দুদার চেহারাটা মনে পড়তে লাগল। যীশুর ভক্ত যারা তাদের শাসনে শৃংখল পরে চব্বিশ বছরের একজন সৌম্যদর্শন যুবক দ্বীপান্তরে গেলেন।

দিব্যর কেন যে কেবলি সেই অকুতোভয় যুবকের শান্ত, বিমুগ্ধ প্রতিকৃতি মনে পড়ত, আজ সে বুঝতে পারে।

'এই শিকল পরা ছল মোদের শিকল পরা ছল।'

রক্তে অশান্ত অঙ্গীকার নিয়ে শব্দগুলো খনখন করে বাজতে থাকে। সমুদ্রের মতো গর্জন করে ওঠে। ঢেউ-এর পরে ঢেউ।

একদিন ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ লনের এক কোণে ইউক্যালিপ্টাস গাছের তলায় বসে বসে দিব্য সেইসব কথা ভেবেছে। একা একা। আর কাউকে সে কখনও চিনত না। কাউকে চিন্তার ভাগ দিতে পারেনি। দিতে পারেনি এমন নিঃসঙ্গ মনে হত না দিব্যর। কী করে

একাকী সে কাটাল প্রথম দুই বছর। কলেজে কারো সঙ্গে মিশতে পারেনি।

এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে দিব্য আবিষ্কার করেছিল রাণীদিকে। সম্পর্কে পিসতুতো বোন। রাণীদির বর সুবিনয়বাবু একজন আর্টিস্ট। ফাইন আর্টসের চৌকস ছাত্র ছিলেন সুবিনয়বাবু। অতি লাজুক প্রকৃতির ভালো মানুষ। ছবি এঁকে কোনো ভদ্রমানুষের দিন চলত না সেদিন, এখনো চলে না। কমার্শিয়াল আর্টের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন সুবিনয়।

দিব্য অবাক চোখে দেখত সুবিনয়কে। একজন শিল্পী যিনি স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্নকে ছবি করে তোলেন। শিল্পীরা সংসারকে দেখে না, তারা অন্য জগতের লোক। ব্যবহারিক জীবনে তারা অসমাপ্ত মানুষ সবটুকু নয়। এসব কথা দিব্য শুনেছে। কিন্তু সুবিনয়দাকে দেখে দিব্যর আশ্চর্য ভাল লাগল। আপনভোলা, স্বপ্নময় দৃষ্টি চোখে।

সারাক্ষণ কেবল ডাকেন, রাণীদিকে। রাণীদি ভাগ্যবতী। সুবিনয়দার মতো বর পেয়েছেন। দিব্যর মনে হয়।

বুঝলে দিব্য, আর্ট শিখে এখন বণিকের দালালী করছি। শিল্পীদের এদেশে জন্মানো পাপ। ইটস্ এ ক্রাইম টু বি বর্ণ ইন দিস্ ল্যাণ্ড।

দিব্য সেদিন শুনে মনে করেছিল সুবিনয়দা হতাশ হয়ে এ কথা বলছেন। দেশে আগুন জ্বলছে, নাই বা হলো ব্যক্তির আকাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণ।

এভরি থিং ক্যান ওয়েট বাট স্বরাজ ক্যান নট।

স্ফূর্তিচারণে দিব্যর চোখের সামনে অতীতের গ্রন্থিগুলো খুলে যায়। কোন কিছুই অপেক্ষা করতে পারে না। যা আকাঙ্খিত তাকে পিছনে ফেলে অন্য অভাবনীয়, দুর্নীরিক্ষ্য কোনো কিছুর জন্য মানুষ প্রতীক্ষায় বসে থাকবে কতদিন।

এদেশে জন্মানো পাপ—কথাটা ঘুরিয়ে কে যেন বলেছিল, জন্মানোটাই পাপ। টু বি বর্ণ ইজ এ ক্রাইম।

অনেকবার এই কথাটা দিব্যর মনে হানা দিয়েছে। মগজে আগুন

ধরিয়ে দিয়েছে এই চিন্তা।

ছিঃ ছিঃ দিব্য তুমি জন্মের জন্য অনুতপ্ত। মানুষ সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সে কবি, সে শিল্পী, তার প্রতিভা প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করেছে। নিজের সত্বা সীমা চূর্ণ করে তার জয়যাত্রা আকাশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। য়ুরী গগারিন এসে কি বলেছিল, তোমার মনে নেই। পৃথিবী এত সুন্দর। মহাকাল কি আশ্চর্য সম্ভার সাজিয়ে রেখেছে বিজয়ী মানুষের জন্য। The space is waiting for its poets and painters.

ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা করে না, তাকে বদলাবার জন্য হাত লাগাও।

দিব্য সচকিত হয়। চিন্তার জটগুলো খুলতে থাকে। সে উঠে দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে থাকে অস্থিরভাবে। কাজ! কাজ চাই। ওথেলোর অকুপেশন গন।

"মস্কো, ৬ই এপ্রিল—লুনিক-৪ আজ গ্রীণউইচ সময় ১৩-২৪ মিঃ (ভারতীয় সময় ১৮-৫৪ মিঃ) চাঁদের ৫,৩০০ মাইল ওপর দিয়ে দুরন্ত-বেগে মহাকাশে এগিয়ে গেছে বলে টাস্ সংবাদ দিয়েছে। জানিয়েছে রয়টার।"

সুবিনয়দা পারেননি। কমার্শিয়াল আর্টের কাছে শিল্পী বন্দী হলেন। অন্য মানুষ হলে তাঁর এই দুঃখবোধ হতো না। যারা স্বল্পে তৃপ্ত, স্থির উপার্জন, স্থিরতর সংসার, একটু বাসা, সীমায়িত ভালবাসা—এমন অনেক লোক আছে সংসারে। তারা আফিসে যান, বড়োবাবুর কথা মতো ঘাড় গুঁজে কাজ করেন। দেড়টায় টিফিন হলে কৌটো খুলে দুখানা পরটা কিংবা চারখানা লুচি, সঙ্গে একটু আলুর দম, কোনোদিন বা ডালডায় ভাজা হালুয়া খান। চার পয়সার এক ভাঁড় চা। ছুটি হলে নাস্ত বিস্তর জন্য কিছু হাতে করে অথবা বউয়ের ফরমাস কিনে নিয়ে বাড়ী ফেরেন।

এরা কি অসুখী। এরা দরিদ্র, কিন্তু অনুতাপের জ্বালায় জ্বলছে। সুবিনয়দার মতন আগুনে পোড়েন না।

বাংলাদেশে এরাই তো সংখ্যাধিক্য, মেজরিটি তো এদেরই।

অবিনাশ চাটুজ্জে চিঠি দিয়েছিলেন সুবিনয়দার কাছে। 'দিব্যজ্যোতিকে তোমাদের ভরসায় পাঠালাম। তোমরা দেখো, মা-মরা ছেলে।'

স্টেশনে আনতে গিয়েছিলেন রাণীদি আর সুবিনয়দা। সেই দিনটির কথা দিব্যর মনে আছে। প্রথম কলকাতাকে দেখা। এত শুনেছে, এত পড়েছে।

—হ্যালো ইয়াং ম্যান, সুবিনয়দার প্রথম সম্ভাষণ, ওয়েলকাম টু আওয়ার সিটি। আজকে এলাম আমরা দুজন, একদিন হাজার হাজার মনুষ এসে শ্লোগান দেবে: থ্রি চিয়ার্স ফর দিব্যজ্যোতি। তাই না, কী বলো রাণী!

তোমার যেমন। এখানেই বক্তৃতা সুরু করে দিলে। রাণীদি বলেন।

এখানে মানে? এখানেই তো বলবো। আমরা থাকবো না, কিন্তু এই প্লাটফর্ম থাকবে। দিব্যর মনে পড়ছে। বলেই প্রবল হাসিতে সচকিত করে দেন সুবিনয়দা।

তিনি ভীষণ আত্মবিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। স্বর্ণহৃদয়। রাণীদিরও।

বিশ্বাসের জোরে মানুষ কতদিন আর সংগ্রাম করতে পারে? মানুষের যৌবন যখন থাকে বিশ্বাস তাকে শক্তি দেয়, সাহস দেয়। যৌবনের জোর কমে এলে বিশ্বাস পরিণত হয় সংস্কারে। বাধা পড়ে যায় মানুষ। সুবিনয়দারও কি তাই হয়েছিল! তিনি কেমন জানি বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন। সোনার হৃদয় আর যেন সুর তুলল না। আর্টিস্ট হয়ে গেলেন কমার্শিয়াল পণ্যের প্রচার বাহক।

ভাবতে কষ্ট হত দিব্যর। এখন নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, এছাড়া আর কিই বা ছিল যা সুবিনয়দা করতে পারতেন?

রাণীদিকে আশ্চর্য মনে হত দিব্যর। দিব্যর চেয়ে কয়েক বছর বড়। এমন শান্ত করুণার মুখশ্রী দিব্য আর দেখেনি। দিব্য তাকিয়ে থাকত। মাকে দিব্য দেখেনি। রাণীদিকে দেখে মনে হত মায়েরা এমন হয়।

রাণীদি বলতেন, দিব্য তুই বড্ড বেশি ভাবুক।

কই না তো। লাজুক মুখে দিব্য উত্তর দিত।

একটুও হাসিস না। কেবল ভাবনা নিয়ে থাকিস।

ভাবি না রাণীদি, আমাকে ভাবায়।

কী ভাবায় আবার। রাণীদি বিস্মিত হন।

মানুষের দুঃখ।

সেই ভাবনা দিব্যর এখনও আছে। মানুষের জন্য সে ভাবে। নিজের জন্য ভাববার সময় সে পায় নি। মানুষ এত কষ্ট পায়! এত তাদের দুঃখ।

তুমি ভাবো কেন দিব্য? সভ্যতার সুরু থেকে অনেক মহৎ মানুষই ভেবেছেন দুঃখ দূর করবার জন্য। ক্ষুধার দুঃখ, রোগের দুঃখ, অন্তরের দুঃখ। তবুও আজ ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে এসেও মানুষের দুঃখ দূর হয় নি।

"পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি লোক ক্ষুধায় পীড়িত কিংবা পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষিসংস্থার উদ্যোগে গত ১৭ই থেকে ২৪ মার্চ রোমে অনুষ্ঠিত ক্ষুধা থেকে মুক্তি সম্মেলনে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তাতে জানা যায় যে, পৃথিবীর ৫০ কোটি লোক আজ কায়ক্লেশে কোনো রকমে টিঁকে রয়েছে। আরও ১০০ কোটি উপযুক্ত খাদ্য ছাড়াই কোনমতে বেঁচে আছে।"

দিব্য পড়েছিল খবরটা দৈনিক সংবাদপত্রে। হাজার বছর হয়ে গেল মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের পথ আবিষ্কার করেছে। এখনও ক্ষুধা থেকে মানুষের মুক্তি হল না। দিব্য যা চিরকাল ভেবে এসেছে আজও সেই ভাবনায় সে বিচলিত হয়।

রাণীদি বলতেন, দিব্য তোর কষ্ট হয় না।

কীসের কষ্ট? দিব্য ছোট্ট জবাব দেয়।

বাড়ি থেকে এতদূরে আছিস্। একা একা।

সেটা কি একটা কথা হলো রাণীদি। আমি যে দূরে থাকবো বলেই এসেছি। কলকাতাকে আমার আবিষ্কার করতে হবে। রাণীদি দিব্যকে

ছোট ভাবতেন। গ্রাম থেকে সম্ভ আসা কিশোর। ভাবা স্বাভাবিক। কিন্তু দিব্য জানত তাকে ভাবতে হ'বে শুধু তাকে কেন, তার যুগের সকলকেই ভাবতে হ'বে।

বড় কঠিন যুগে জন্মেছি আমরা। ইতিহাস এমন সময় আর দেয়নি কখনো। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ। একদিকে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে নিত্য নতুন আবিষ্কার করছে, করায়ত্ত হচ্ছে অজ্ঞানা রহস্য। অন্যদিকে এই পৃথিবীর মানুষই ক্ষুধার অন্ন জুটোতে পারছে না। এই সব তখন ভাবত দিব্য।

ওই বইগুলোই তোর মাথা খেলো। রাণীদি বলতেন। রাণীদি সাধারণ মেয়ে। সামান্য লেখাপড়া জানতেন। মমতা ছিল, স্নেহ ছিল। ভাল লাগার দুর্বার আকর্ষণও তার ছিল। কিন্তু দিব্যর মতো তিনি ভাবতে পারতেন না।

দিব্য একদিন, বলল, রাণীদি তুমি পড়বে?

আমি? অবাক হয়ে যান রাণীদি, কী বিদ্যে আছে আমার যে পড়বো।

পড়লেই জানাতে পারবে। দিব্য গভীর বিশ্বাস নিয়ে উত্তর দেয়। সে চাইত রাণীদি পড়ুক, জানুক। তার চিন্তার ভাগ নিক।

বেশ তো, তুই পড়াবি?

কেন, তুমি নিজে নিজেই পড়বে। আমরা দুজনে মিলে পড়বো।

সবচেয়ে খুশী হলেন সুবিনয়দা। তিনি চাইতেন রাণীদি পড়ুক, দিব্যর সঙ্গে পড়লে অনেক কিছু জানতে পারবে। ব্রিলিয়্যান্ট ছেলে দিব্য।

আমাকে তত্ত্ব শিখিও না পণ্ডিত মশায়। রাণীদি বলতেন। ইদানীং ওই বিশেষণটুকু দিব্য উপার্জন করেছিল তার গাম্ভীর্যের জন্য।

কী শিখবে তুমি, রস? দিব্য বলে।

রস থেকেই তো তত্ত্বের উদ্ভব। কোনো ঝগড়া নেই দুয়ের মধ্যে। পরীক্ষার পড়া তৈরী করতো দিব্য। তারি ফাঁকে ফাঁকে চলত রাণীদির পড়া। আশ্চর্য পড়ার আগ্রহ ছিল ওর। রাণীদি পড়লেন, মাট্রিক

পাশ করলেন। কলেজেও ভর্তি হলেন। রাণীদি পরে স্কুল টীচার হয়েছিলেন।

অনেকদিন হয়ে গেল। কতদিন রাণীদির সঙ্গে দেখা নেই। তার জীবন বড় ট্র্যাজিক, বড় করুণ।

রাণীদিকে দিব্য ভুলতে পারে না। তার মধ্যে দিব্য যেন নারীত্বের নতুন রূপ আবিষ্কার করেছিল। কিশোর চোখে দেখা এই নারীকে দিব্যর মনে হয়েছিল স্বপ্ন আর বাস্তবের সহজ সম্মিলন। রাণীদি স্বপ্নও ছিলেন, বস্তুজগতের সঙ্গেও তার বিরোধ ছিল না। পটলডাঙ্গায় সেই ছোট্ট দোতলা বাড়ীটার কথা দিব্য কখনো ভুলতে পারবে না। এতদিন পার হয়ে গেছে, কতো চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে পথ কেটে এগুতে হয়েছে। কখনো হতাশা তাকে আবৃত করেছে, কখনো আশার আলোকে মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। দিব্য তবু আঁকড়ে ধরে রেখেছিল যা সত্য, যা সার্থক, আকাঙ্ক্ষিত ও শ্রেয়। অনেকে বলবে, দিব্য আইডিয়ালিস্ট এই খড় বিচলির যুগে আদর্শ শস্যকণার মূল্য কি? সে বিকোবে কি দরে?

এই প্রশ্ন যখনই দিব্যর মনে হয়েছে তখনই রাণীদির মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। সর্বসংহা পরিত্রীর মতো, কোমল তৃণদলের মতো; তিনি হয় তো কিছুই করতে পারেন নি, দেখাতে পারেন নি তার ভিতরের সেই অসামান্য শক্তি যার পরিচয় দিব্য জানে, আর জেনেছিল সুবিনয়দা। দ্বিতীয় এমন নারী সে দেখে নি। জীবনের বন্ধুর পথ মাড়াতে মাড়াতে অনেকবার কাঁটা ফুটেছে পায়ে, রক্ত ঝরেছে। দিব্য ক্লান্ত হয়েছে, উদ্বেগের স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছে কপালে। কখনো সে থমকে দাঁড়িয়েছে। মনে হয়েছে, আর না। এবার ক্লান্ত হয়ে বসে পড়বে বোধ হয়। ক্লান্ত হয় নি সে। রাণীদির কথা মনে পড়েছে। সেই স্মৃতি তাকে জুগিয়েছে সাহস, দিয়েছে প্রেরণা।

সুবিনয়দা অতৃপ্ত ছিলেন রাণীদিকে নিয়ে নয়, জীবিকার বিড়ম্বনায়; তিনি শিল্পী হ'তে চেয়েছিলেন, হয়ে গেলেন আর্টিসান। আর্টিস্টের সত্তাকে হত্যা করে তাকে শিল্পের মজুরীতে নিয়োগ করলে মানুষ কি

নিয়ে বাঁচে ?

সুবিনয়দার অতৃপ্তির মূলে ছিল এই দ্বন্দ্ব।

কলেজ থেকে ফিরতে সেদিন দিব্যর দেরী হয়েছিল। ফিরতি পথে সুনীলদের বাড়ি গিয়েছিল রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীটে। কোনো কোনো দিন দিব্য লাইব্রেরীতে যেত ছুটির পর। তা না হলে সোজা বাড়ি। রাণীদি অপেক্ষা করে থাকতেন। সুবিনয়দা ফিরতেন একটু রাত করে। তাস খেলতেন তিনি। হয় তো নিজেকে ভুলে থাকবার জন্যই।

রাণীদি বিকেল হলেই নিজের বইপত্র গুছিয়ে রেখে দিব্যর জন্য খাবার করতে বসতেন। নানারকম খাবার তৈরী করতে জানতেন। মা মরা বাড়িতে দিব্যর ভাগ্যে বিচিত্র খাবার কোনো দিন জোটেনি। খেতে সে ভালবাসত। কয়েকদিনের মধ্যেই রাণীদি টের পেয়েছিলেন। সুবিনয়দা ছিলেন এ বিষয়ে উদাসীন।

এই মানুষকে নিয়ে কি সুখ আছে। রাণীদি কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করতেন।

কেন ?

কেন আবার কি ? কোনো কিচ্ছু মুখে দেবেন না। বলবেনও না এটা তৈরী করো। যা দেবে তাই।

ভারী অন্যায়। দিব্য মুচকি হেসে বলত।

তোর ওই এক কথা। বল্ কি খাবি ? গোকুল পিঠে ?

বিস্তর খাবার তৈরী করতেন রাণীদি। খেতে খেতে গল্প হতো। সুবিনয়দা কোনো কোনো দিন যোগ দিতেন।

আচ্ছা দিব্য, তোমার কি মনে হয় না জীবনের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু না পেলে, সবটাই ব্যর্থ। সুবিনয়দার প্রশ্ন।

আহা হা, অতটুকু ছেলের কাছে প্রশ্ন দেখো।

রাণীদি থামিয়ে দিতে চাইতেন।

ওকেই তো প্রশ্ন করবো। ও যে ভাবুক।

দিব্য কি উত্তর দেবে ভেবে পেত না। সুবিনয়দার মনের ভাঁড়ে এক আশ্চর্য অসুখ। এই অসুখে দিব্যও আক্রান্ত হয়েছিল পরে। এই

যুগটাই আক্রান্ত মানসিকতার। জীবনের আকাঙ্ক্ষিত কি, দিব্য স্পষ্ট তখনও জানত না। শুধু জানত মানুষকে নতুন পথ করে জিততে হবে, এই পঙ্গু, বিবর্ণ, অশক্ত জীবন তার জন্য নয়। আরও বৃহৎ, আরও প্রসন্ন, আরও উজ্জ্বল। পতঙ্গ কি নক্ষত্র হতে চায়? দিব্য কখনও নিজেকে পতঙ্গ ভাবেনি। নিঃসঙ্গ, সরল ছিল ওর জীবন দর্শন। অমানুষিকতার কশাঘাত পিঠের ওপর পড়ছে। মানুষের যেন দাঁড়াবার শক্তি নেই।

সুবিনয়দার প্রশ্নের উত্তর তখন সে দেয়নি। পরে তার উত্তর সে খুঁজে পেয়েছিল। বাঁচতে হলে এই অলাতচক্রের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

মানুষ চাই। গোটা মানুষ।

সন্ধ্যের পর গোলদিঘীটা ওর বেশ লাগত। ছায়ারা কাঁপছে। বায়ু-সেবনের প্রত্যাশী কিছু বয়স্ক লোক পাক খাচ্ছেন, কেউ বা বেঞ্চে বসে গল্প করছেন। দক্ষিণ কোণে একটা বকুল গাছ ছিল। তার অজস্র ফুল ছড়িয়ে থাকত মাটিতে। সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে বকুল ফুলের গন্ধ তরল হয়ে ভেসে বেড়াত।

হেয়ার সাহেবের কবর। এই মানুষটির মৃতদেহকে শাস্তিগ্রহণ করাতে পারল না রক্তভক্ত ইংরেজরা।

ঘাসের ওপর শুয়ে দিব্য আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। আলো জ্বলে উঠছে চারদিকে। শহরের সন্ধ্যাপ্রদীপ। তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালানো দিব্য অনেকদিন দেখেনি। কিন্তু শহরের এই বাতিজ্বলা দেখতে অদ্ভুত শিহরণ লাগে দিব্যর। আকাশে তারা ফোটার মতো। এই শহর তাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করেছিল।

এত আলো। সেনেট হলের কোরিন্থিয়ান থামগুলো দেখলে তার জুলিয়াস সিজারের কথা মনে পড়ত। মার্ক এন্টনীর কথা। গোলদিঘীর জল কাঁপে। সাঁতার শিখতে যারা এসেছিল অনেকক্ষণ তারা চলে গেছে। দিব্য শুয়ে শুয়ে ঘাসের কোমল গন্ধ পাচ্ছিল। ঘাস দেখলেই ওর ছুঁতে ইচ্ছে করে। মাটির গন্ধ। অঞ্জনপুরে কথা মনে পড়ত।

ছবির মতো সেই স্মৃতির চিত্র মনের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। কারা বেড়াচ্ছে? কতকগুলি বৃদ্ধ, বিগতক্ষুধা মানুষ। এরাও একদিন তরুণ ছিল। দিব্য মানুষগুলিকে গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখত। দিব্যকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল। এই বিশাল জনারণ্যে সে একা। কতকগুলো বই, সুবিনয়দা আর রাণীদিকে ছাড়া ওর সঙ্গী আর কে? প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিং-এ পুরোনো বইয়ের দোকানী রফিকের সঙ্গে ওর সম্প্রতি পরিচয় হয়েছে। ওর কাছ থেকে দুষ্প্রাপ্য পুরোনো বই কেনে দিব্য। একদিন স্পেংগলারের ডিক্লাইন অব দি ওয়েষ্ট বইটি কিনেছিল একটাকা দিয়ে ওখান থেকে। সেনেট হলটার দিকে তাকালে অদ্ভুত শিহরণ লাগে দিব্যর। এই সিঁড়ি দিয়ে কত বিখ্যাত বরেণ্য লোক একদিন উঠেছেন। এই গোলদিঘীও কি কম স্মৃতি বুকে নিয়ে চুপ করে আছে। শিবনাথ শাস্ত্রী, বিদ্যাসাগর, ডেভিড হেয়ার, মধুসূদন, গৌরদাস বসাক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডিরোজিও···আরও কত নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল নাম। এদের মধ্যে দুজন দিব্যকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করত। দুই বিপরীত চরিত্রের মানুষ—বিদ্যাসাগর আর মাইকেল। দুই মেরুবিন্দু অথচ কি দুর্নিবার আকর্ষণে দুজনে পরস্পরের কাছে এসেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মতো মানুষ বাংলাদেশে জন্মায়নি। সুসজ্জিত দীপশিখার মতো উজ্জ্বল, দ্যুতিময়। হৃদয়বান অথচ কি কঠোর যুক্তিবাদী। মধুসূদনকে তিনি চিনেছিলেন। সেজন্যেই ব্যবহারিক জীবনের মাত্রারিক্ত দোষ তিনি মায়ের মতো ক্ষমা করতে পেরেছিলেন। বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরকে আর কেউ মনে রাখল না। গোলদিঘীতে বিদ্যাসাগরের মূর্তিটির সামনে দিব্য প্রতিদিন আনত হত।

গোলামের দেশে এই চরিত্রবান মানুষের মর্যাদা হলো না। দিব্যর চোখ ছল ছল করে উঠল।

গোলদিঘীর জল কাঁপে। রেণেসাঁসের আগুন নিভে গেছে। বদ্ধ জলে কি আর সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়? দিব্য একদৃষ্টিতে কম্পমান ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

কাল রাণীদি বলেছিলেন, দিব্য তুই কি হবি?

দিব্য উত্তর দিতে চায়নি।

বল না রে। আমার শুনতে ইচ্ছে করে।

কিছু হতে চাই নে রাণীদি, কিছু করতে চাই।

ওই তোর হেঁয়ালী সুরু হলো। রাণীদি কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সত্যি বলছি রাণীদি, কিছু হওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

দিব্য নরম সুরে মাথা নীচু করে বলে, যাঁরা হতে পারবেন তাঁরা কারাগারে। আমরা তো কিছুই দিইনি, ত্যাগ করিনি। আমাদের এখন কিছু করতে হবে।

আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে দিব্যর সেই কথাগুলি ঘুরে ঘুরে মনে পড়তে লাগল। সে কী করবে, কিছুই জানে না। স্কলারসিপ পেয়েছে, কলেজে পড়ছে। এত জানার বিষয় রয়েছে। সে কি তার অংশমাত্র কোনো দিন জেনে আরও করতে পারবে? ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে পড়ত। কলকাতার এই আলো, এই কোলাহল, ঘরবাড়ী—সব-কিছুর মধ্যে সাফল্যের নীরব স্বাক্ষর রয়েছে। মানুষ সফল হয়। পরিশ্রমে, বুদ্ধিতে, অধ্যবসায়ে। দিব্যর কেমন জানি অসহায় মনে হতে থাকে নিজেকে। কীসের জন্য মেঘনার তীরের গ্রাম থেকে ছুটে এসেছে কলকাতায়।

অবিনাশ?

সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল ব্রুটাসের কথাগুলি:

Tears for his sorrow, joy for his fortune, honour for his valour and death for his ambition.

তুমি ভুল করেছিলে ব্রুটাস্। এম্বিশন ছাড়া মানুষ থাকে না। মানুষ বড় হতে চায় শুধু নিজের জন্য নয়। অন্যকেও ওপরে তোলবার জন্য। হয়তো দিব্য নিজের মনের সঙ্গে এক করে, সান্ত্বনা দেয় নিজেকে। কিন্তু একথা ঠিক দিব্যর মনে উচ্চাকাঙ্খা ছিল। তার বাবা অবিনাশ চাটুজ্জে এই উচ্চাকাঙ্খার বীজ বপন করেছিলেন, ছেলের মনে। পায়ের তলায় যার মাটি নেই, তাকে দাঁড়াবার জন্য ঠাঁই খুঁজে

নিতে হবে। নইলে সবাই পা দিয়ে মাড়িয়ে যাবে। সেই দুঃসহ অভিজ্ঞতা দিব্যর বাবা পেয়েছিলেন বলেই ছেলেকে বড় হতে বলতেন।

পিতার কাছে অলিখিত অঙ্গীকারে দিব্য আবদ্ধ ছিল। সে যে সত্যের কাছে প্রতিশ্রুত। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতির মূল্য কী? দিব্য জানে তার পক্ষে এম্বিশাস্ হওয়া মানায় না। বাঁচতে সে চায়, মানুষের মধ্যে মাথা উঁচু করে না বাঁচলে সবাই দলিত মথিত করে চলে যাবে।

তুই কী হবি দিব্য?

আবার রাণীদির সেই প্রশ্ন মনে পড়ে।

গোলদীঘির জলে যেন আগুন ধরে যায়।

চারদিকে আগুন। জতুগৃহের মতো বেষ্টন করে জ্বলছে।

দিব্যর মাথার ভিতরে আগুন।

স্বর্ণাবয়ব নকুল

রামপ্রসাদ সেন

"বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধাবসানে এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল। ধর্মনন্দনের মহাদানের বিষয় দশদিকে প্রচারিত ও তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতেছে, এমন সময় এক নকুল যজ্ঞক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইল। ঐ নকুলের মস্তক ও গাত্র একপার্শ্বে সুবর্ণময়। নকুল যজ্ঞভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া মনুষ্যবাকে ভূপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল—হে ভূপালগণ! এই অশ্বমেধ যজ্ঞকে কুরু-ক্ষেত্রনিবাসী এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের একপ্রস্থ সক্তুদানের তুল্য বলিয়াও নির্দেশ করা যায় না। সেই সলিলসিক্ত সক্তুর উপর বিলুণ্ঠিত হওয়ায় আমার অর্ধশরীর সুবর্ণময় হইয়াছে। তদবধি আমার অবশিষ্ট অঙ্গ সুবর্ণময় করার প্রত্যাশায় বারংবার বিবিধ যজ্ঞস্থলে বিচরণ করিতেছি, কিন্তু কুত্রাপি আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। এই কথা কহিয়া নকুল প্রস্থান করিল।"

নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর একান্নবর্ত্তী একটি পরিবার।

মন যুগিয়ে চলতে হয় আত্মীয়-কুটুম্ব, পাড়াপ্রতিবেশী সকলেরই। সমাজ-বিধি রাষ্ট্রনীতি, দেশাচার, লোকাচার মানতে হয় সব কিছুই। জামাই পাওনাদার, অতিথি ও ভিখারী, অধ্যাপক, জ্যোতিষী, ডাক্তার, সতীমা, সন্তুষ্ট রাখতে হয় সকলকেই। এতটুকু ক্রটী কেউ সহ্য করবে না, মার্জনা করবে না তিল পরিমাণ দোষও।

সকলের আশীর্বাদ কুড়ান সত্ত্বেও একটা না একটা অঘটন লেগেই আছে সংসারে।

গলায় ঘা হয়ে, তিন বছর ভুগে, বড়কর্তা আজ কদিন হ'ল মারা গেছেন।

তা বলে কি আর সংসারটা চলছে না? চলছে বৈ কি! শক্-

বাহকদের মধ্যে একজন বেঁটে লোক থাকলে শবাধারটা যেমন টেরচা-ভাবে চলে, তেমনি চলছে।

সামাজিক ক্রিয়াকর্ম চিরদিন ঘটা করেই হয়ে থাকে এ বাড়ীতে। এবারেও তাই হ'ল।

মেজকর্তার ছেলে চাকরি করে দিল্লীতে। টেলিগ্রাম করা হল তাকে—যেমন করে হোক কিছু অর্থ সংগ্রহ করে সে যেন চলে আসে তার জ্যাঠার শ্রাদ্ধে।

বলতে গেলে সে-ই সমস্ত ঝক্কিটা নিলে মাথায়।

অনেকদিন পরে ছেলে-মেয়েদের গায়ে আবার নতুন জামা-কাপড় উঠলো। নিয়ে গেলো সবাইকে একদিন সিনেমাতে নিয়মভঙ্গের পর।

বাইরের ঘরে প্রতিবেশীদের তাস খেলা চলেছে সমানেই। মরণা-শৌচেও বাদ পড়েনি। বিজ্ঞ বন্ধুরা বলেন, তাসখেলা হচ্ছে একটা 'ইন্টালেক্চুয়েল গেম'। তাই কর্তাদেরও মাঝে মাঝে বসতে হয়।

সেদিন সকাল বেলার চা বন্টন করবার সময় হঠাৎ সেজগিন্নীর মনে হ'ল, তাঁর দ্বাবিংশতি বয়স্কা অনূঢ়া কন্যা দীপ্তি আজ ক'দিন থেকে চা-পর্বে অনুপস্থিত। দোষ তাঁকে দেওয়া যায় না। বাড়ীর এককুড়ি আইবুড়ো মেয়ের মধ্যে এক-আধজন যদি এদিক ওদিক হয়ে যায়, চট্ করে ঠাহর করা কঠিন। সবাইকেই তো আর চোখে চোখে রাখা যায় না।

খোঁজ অবশ্য পাওয়া গেল। নিতাই কুণ্ডুর মেজ ছেলে শ্রীবিলাস দীপ্তিকে রেখেছে চেতলায়। বিয়েও নাকি করবে বলেছে।

রাত্রে কর্তাদের কানে কথাটা তোলা হ'ল। উদ্বিগ্ন হয়ে আর কাজ কি? যা হবার তা তো হয়ে গেছে। আত্মীয় প্রতিবেশীদের অবশ্য বলতে হ'ল, দীপ্তি গেছে তার এক মাসীর বাড়ী। সোঁদর বনের আবাদে, মাত্‌লা নদী পার হয়ে ভাঙনখালীর ওধারে।

শ্রাদ্ধের পর মাস দুই কেটে গেছে। মেজকর্তা একদিন পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ রে তুই কতদিনের ছুটি নিয়ে এসেছিস? এখনও ফিরে গেলি না দিল্লীতে?

মাথা নীচু করে ছেলে উত্তর দিলে, "সেখানে আর ফেরবার উপায় নেই বাবা, আমায় আর কিছু জিগ্যেস কোরো না।"

সেদিন জামাইদের ছিল নিমন্ত্রণ। বৈঠকখানায় ব্রিজ খেলাও চলছিল পুরোদমে। অপদেবতার মতো উঁকি দিলে পুলিস।

চট্ করে মেজকর্তা উঠে গেলেন বাইরে। খেলায় মত্ত জামাই বাবাজীরা অতটা লক্ষ্য করলেন না। তর্কনিরত, জ্যোতিষী এবং অধ্যাপকও বিশেষ নজর দিলেন না সেদিকে।

ঘণ্টাখানেক বাদে তিনি ফিরে এলেন। দশমবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র, ফণ্টে, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেললে, "জ্যাঠাবাবু, পুলিস এসেছিল কেন?"

মেজকর্তা উত্তর দিলেন, "ও—বাড়ী ভুল করেছিল।" জামাইদের পাশে বসে দেখতে লাগলেন তাদের খেলা। জিজ্ঞাসা করলেন কার কি কল্। মাঝে মাঝে বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে সায় দিতে লাগলেন অধ্যাপকের অকাট্য যুক্তির কথায় এবং জ্যোতিষীর অবধারিত গ্রহ-ফলের কথায়।

পরদিন প্রভাতে চা বিতরণের সময় সেজগিন্নীর নজরে পড়ল, দিল্লী থেকে আগত ভাশুরপোটির চায়ের গেলাসটা আজ হয়েছে বাড়তি।

মেজকর্তা বললেন, আজ একটু দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছি। বরানগরে আমার বন্ধু অমূল্যের বাড়ীতেই খাওয়া দাওয়া করব। বেরুতে যাচ্ছেন ছাতা আর চাদর নিয়ে, কলঘরের পাশে, খিড়কির দরজায় মৃদু করাঘাত শুনে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, "উলি, খুলে দে তো দরজাটা, কে যেন এসেছে মনে হচ্ছে?" উল্লাসী দরজা খুলতেই দেখা গেল, দীপ্তি দাঁড়িয়ে। চোখে নিয়ে এসেছে মরামানুষের নিষ্পলক চাউনি।

মেজকর্তা এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন "এসেছিস দীপা? আয়, বাড়ীর ভিতরে আয়!"

দক্ষিণেশ্বর যাত্রাই হ'ল তাঁর অগস্ত্যযাত্রা।

আবার ঘটা করে শ্রাদ্ধ হয়। আত্মীয় পরিজনে গম্‌গম্ করতে

থাকে। চলতে থাকে প্রতিবেশীদের তাস খেলা। জামাই, পাওনাদার, অতিথি, ভিখারী, অধ্যাপক, জ্যোতিষী, সন্ন্যাসী, ডাক্তার, আপ্যায়িত হয়ে চলে যান সকলেই।

সৌজন্যের অভাব কোনোদিন কেউ দেখতে পেলে না এদের সংসারে।

ফন্টে চীৎ করে উঠলো, 'ও কাকু দেখুন দেখুন, একটা বেজি এসেছে। কি রকম করছে দেখুন? লাহাদের পোষা বেজিটা নিশ্চয়ই চেন্ ছিড়ে পালিয়ে এসেছে।" সবাই ছুটে এলো। দেখলে অল্পপরিসর উঠানের উপর সেটা গড়াগড়ি খাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে স্থির হয়ে, বেজিটা ঘাড় কাত করে চেয়ে রইল সকলের মুখের দিকে। সেই উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের একপ্রস্থ সক্তুদানের চেয়েও বোধহয় বড় মনে হল এই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ঐতিহ্যানুযায়ী সৌজন্যবোধ। সবিস্ময়ে সবাই দেখলে, বহুরূপীর মতো রঙ বদলে সেটা ঝকঝকে হলদে রঙের হয়ে গেছে। উঠান থেকে বাইরের দরজা পর্যন্ত সহসা যেন বিদ্যুৎ চমকাল। অদৃশ্য হ'ল সেই স্বর্ণবর্ণা নকুল।

বোধহয় তার অভীষ্ট আজ সিদ্ধ হয়েছে।

ডানা ভাঙ্গা পাখী

কানু ঘোষ

ঘোর বর্ষা। অথৈ জল 'চিক্‌লী'র বিলে। আশপাশের দোলা (নিচু) জমিন আর রাস্তাঘাট সব ডুবে গেছে। বিল তো নয় যেন সমুন্দর! এপার ওপার নজর চলেনা। পারের হোগলা আর কাশিয়া বনের ডগাগুলো শুধু দেখা যাচ্ছে। মানুষ সমান উঁচু গাছগুলোর বাকি অংশ সম্পূর্ণ তলিয়ে গেছে। বৃষ্টির ঘা আর হাওয়ার দাপটে ডগাগুলো প্রায় নেতিয়ে পড়েছে। মইষা জোঁক আর জল ঢোঁড়া কিলবিল করে ছুটোছুটি করছে জলের বুকে,—হোগলা আর কাশিয়া বনের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে। পাহাড়ী বোড়াও দেখা যায় কদাচিৎ। ছোট শাল গাছের গুঁড়ির মত। ব্রহ্মপুত্র দিয়ে ভেসে এসে তিস্তায় ঢুকে অবশেষে ঠাঁই নেয় 'চিক্‌লী'তে। অসংখ্য মরা জন্তু জানোয়ার আর কাঠও ভেসে আসে আসাম থেকে ব্রহ্মপুত্র দিয়ে। পাড়ের মানুষরা সেগুলো ধরে দু'পয়সা উপরি রোজগার করে নেয়। আর আসে অসংখ্য মাছ—রুই, কাৎলা, মৃগেল, ফলি, ভাঙন,—'চিক্‌লী'তে। নানাজাতের গভীর জলের মাছ। জল যত বাড়ে, কৈ, মাগুর, শোল, খলসে, পুঁটির দল, তত উজিয়ে আসে পারের দোলা জমিনের হাঁটুজলে। আর সেই সময় বের হয় মাছুয়ার দল। বাঁ হাতে হেরিকেন অথবা মশাল, কোমরে গোঁজা খালুই, ডান হাতে বড় হাঁশুয়া, পরনে নেংটী আর মাথায় টোকা চাপিয়ে।

দূর-দুরান্ত থেকে আসে। একা দোকা অনেকে। হাতে পায়ে মেখে নেয় কেরোসিন তেল। জোঁক ধরবার সম্ভবনা হাতে কম থাকে। সাঁঝবেলা খেয়ে দেয়ে এক ঘুম দিয়ে প্রায় মাঝরাতে বের হয় ওরা। থমথমে আকাশে প্রচণ্ড মেঘ গর্জন অথবা টিপটিপ বৃষ্টি হলেই মাছুয়ার সুবিধে। মাছ তখন খেলা করে,—দোলা জমিনের হাঁটুজলে। ভেসে বেড়ায় ঝাঁক বেঁধে। ঠিক তখনই সন্তর্পনে—অতি নিঃশব্দে হাঁশুয়ার

এককোপ। জলের বুক চিরে হাঁশুয়া মুহূর্তে গভীরে প্রবেশ করে। পলকে জল রক্তরাঙা হয়ে ওঠে। ঝাঁকের দু'চারটে কাটা পড়ে। অথবা শোল মাগুর শিঙির পিঠ লক্ষ্য করে ছুটে যায় সুতীক্ষ্ণ 'কোঁচা'। একোঁড় ওকোঁড় করে গেঁথে ফেলে। তারপর অপেক্ষা শুধু খালুইতে তুলে রাখবার। শেষরাত পর্যন্ত চলে এই মাছ মারা। তারপর ডাঙায় উঠে; গা হাত পা মুছে, দু'দণ্ড জিরিয়ে, বিড়ি তামাক খেয়ে যে যার গন্তব্য স্থলে রওনা দেয়। ওদের মাঝে যারা জাতে জালুয়া (জেলে) এবং নিরুপায় তারাই মাছ বাজারে নিয়ে যায় বিক্রি করতে। পেশাটা অনেকের পক্ষেই সম্মানজনক নয়। জানাজানি হলে টাঁরী (পাড়া) তে বদনাম হবার সম্ভবনা আছে যথেষ্ট। তবুও অনেকেই গোপনে এই অসম্মান জনক কাজটা করতে বাধ্য হয় পেটের দায়ে। বেশীর ভাগই পেশা কিষাণ (জনমজুর) আর আধিয়ার (ভাগচাষী)। এই ঘোর বর্ষায় পুরো তিনটে মাস,—আষাঢ়-শাওন-ভাদো—রুজী রোজগার একেবারে বন্ধ বললেই চলে। তাই মাছ মারা আর দল-ঘাস বিক্রি অনেকেরই পেশা হয়ে ওঠে, সামাজিক অনুশাসনের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে।

আকাশে আজ যেন প্রলয়ের পূর্ব্বাভাষ। মেঘের প্রাণঘাতি গর্জন। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে এক টানা। চিক্লীর কালো জলে ছোট ছোট ছোট ঢেউ জাগছে ভাঙছে। অসংখ্য হেরিকেন আর মশালের আলো জোনাকির মত ছড়িয়ে পড়েছে পারের চারপাশে। মাছমারাদের আনাগোনা শুরু হয়েছে।

কাঁথা মুড়ি দিয়ে মাচাং (মাচা) এর ওপর শুয়ে আছে হিঁয়ালু শেখ। গা হাত পায়ে অসহ্য ব্যথা। পালা জ্বর, একদিন বাদ দিয়ে একদিন আসে। গতকাল আসেনি আজ নির্ঘাৎ আসবে। বর্ষার নদীতে বান আসার মত হু হু করে সারা শরীর কাঁপিয়ে জ্বর আসবে। সম্পূর্ণ অচৈতন্ত করে ফেলবে। আর কয়েক ঘণ্টা পর ঘাম দিয়ে ছেড়ে যাবে। উঠে বসবে হিঁয়ালু। একথালা ভাত আর আকালী (লঙ্কা, নিয়ে গিলবে গপাগপ করে। কিন্তু ঘরে আজ চাল বাড়ন্ত। গতকাল মাছ মারতে

যেতে পারেনি সে। তাই উনুনও ধরেনি। কিন্তু তাই বলে ছেড়ে কথা বলবে না হিঁয়ালু। ক্ষুধার্ত পশুর মতই হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বে ছমিরণের ওপর।

নিচে স্যাঁৎসেতে মেঝের এককোণের আগুণের মালসার সামনে বসে সেই কথাই চিন্তা করছিল ছমিরণ। বুকটা ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে মৃদু ভূমিকম্পের মত। কাণ দু'টো সদা সতর্ক শুধু দু'টি শব্দের জন্য,—"ভাত দে"। যদিও এ ঘটনা নোতুন নয়, ছমিরণের কাছে। মাসের পনেরটা দিনই প্রায় এই অবস্থায় কাটে। একরকম গা সওয়া হয়ে গেছে তার। বিক্রি করবার মত ঢেঁকীটা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই ঘরে। কথায় বলে,—আষাঢ়-শাওন-ভাদো-চাষার মরণ। ভাবনার জটিল রেখাগুলো মনের বেলাভূমিতে হিজিবিজি দাগ কেটে চলে। মালসার আগুন কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দেয় ছমিরণ। কাঁথা মুড়ি দেওয়া হিঁয়ালু খুক্ খুক্ করে কাশে। অস্ফুট কণ্ঠের শব্দ শোনা যায়। বোধহয় জ্বর আসছে। ককিয়ে ককিয়ে উঠে ডাকে হিঁয়ালু—

কোঠে গেলু?

—ক্যানে—জবাব দেয় সে।

একনা পাণী দে।

জল গড়িয়ে বদনাটা মুখের কাছে ধরে সে। মাথা তুলে সরু নলটা মুখে লাগিয়ে কিছুটা জল পান করে হিঁয়ালু। কপালে হাত দেয় ছমিরণ। গা আগুনের মত গরম। কাঁথাটা ভালো করে টেনে দেয়। বদনাটা রেখে আবার এসে বসে মালসার ধারে। কড় কড় কড়াৎ! কোথাও বোধহয় বাজ পড়লো। মনে মনে আল্লার নাম নেয় সে। মুড়ি দেওয়া কাঁথার ভেতর থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় হিঁয়ালু যেন হঠাৎ গর্জ্জন করে উঠলো: শা—দেওয়ার তাও কি! যেনে আজরাইলের বাচ্চা—

বাতাসের ঘায়ে হঠাৎ দরজার ঝাঁপাটা খুলে গেল। হাওয়ার পাখায় ভর করে কয়েক মুঠো বৃষ্টির ফোঁটা লুটিয়ে পড়লো মেঝেতে, ছমিরনের গায়ে। বিরক্ত হয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়ালো সে। বাঁশের ছড়কোটা তুলে

নিয়ে দরজার দিকে এগোলো, ঝাঁপ বন্ধ করতে। বিদ্যুতের তীব্র ঝিলিকে তার যেন মনে হলো রাস্তার ওপারে আম গাছটার নিচে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি। বিস্মিত হলো সে। এই দুর্যোগঘন রাতে ওভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে কে। টাঁরীর কেউ? তাহলে তো তাকে ডাক দিত। চৌধুরী বাড়ির ছোট ছেলেটা নয়তো? শঙ্কিত হয়ে উঠলো সে। অতি দ্রুত হুড়কোটা চেপে দিল ঝাঁপের ওপরে।

বৃষ্টির ছাটে পরণের "ছ্যাওটা (এক ফালি কাপড় বুক থেকে হাটু পর্যন্ত জড়ানো)-র খানিকটা বেশ ভিজে গেছে। শীত শীত লাগছে। প্রায় কাঁপুনি ধরে গেল। ছেড়ে ফেলবার মত দ্বিতীয় বস্ত্র আর নেই। কিন্তু ছাড়তেই হলো। বিবস্ত্র হয়ে মালসার ধারে বসলো। ভিজে ছ্যাওটা'টা দু'হাতে মেলে ধরলো আগুনের ওপরে। এক কোনায় বাঁশের খুঁটির ওপরে রাখা ছোট্ট কেরোসিন কুপীটা কালচে ধোঁয়া ছড়িয়ে জ্বলছে; শিখাটা পলকে পলকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। হয়তো যে কোন মুহূর্তে নিভে যেতে পারে—আচম্‌কা।

'ছ্যাওটা'র আর একটা দিক ঘুরিয়ে ধরলো। কুপীর অগ্নি শিখাটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে সে যেন আনমনা হয়ে উঠলো। পেছনের দিনগুলো যেন একটার পর একটা সার বেঁধে এসে দাঁড়ালো মনের তটভূমিতে। কাঠ কয়লাগুলো পুড়ে গনগনে হয়ে উঠেছে। লাল আভা ছড়িয়ে গোটা মালসাটা ঘিরে। হিঁয়ালু বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ফেলে আসা দিনগুলোর কথা শুধু মনে পড়ছে। বুকের ভেতরটা অব্যক্ত ব্যথায় টনটন করে উঠছে। মাত্র এক বছর হলো হিঁয়ালুর সাথে তার নিকা হয়েছে। এর আগে বিয়ে হয়েছিল পাগলা পীরের এক সন্ন্যাসী জয়নাল শেখের সাথে। বুড়ো জয়নালের সে ছিল চতুর্থ-পক্ষ। শরিয়তী মতে চারটে বিয়ে করবার অধিকার ছিল বুড়ো ব্যাপারীর। আর তাই সে করেছিল চৌদ্দ বছরের ছমিরন্নেষাকে নিকে করে ঘরে এনে। অপার বিস্ময়ে স্বামীর মাথার সাদা ধপধপে চুলগুলো দেখে, মনের আবর্ত্তে একসাথে লাখো প্রশ্নের যে ঢেউ জেগেছিল তা মনেই গুমরে গুমরে মরলো। গরুর গাড়ীতে স্বামীর পাশে বসে পাঁচ

মাইল কাঁচাপথ সে একরকম মৃতের মতই এসেছিল। নির্ব্বাক নিঃস্পন্দ। পুরো দুটো বছর ব্যাপারীর ঘর করতে হয়েছিল। ঘর করা না বলে হাজতবাস বলাই বোধহয় উচিত। ঠোঁটের কোণে এক টুকরো মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। নড়ে চড়ে বসে সে। বাইরে বোধ হয় ঝড় উঠেছে।

ছ্যাওটা'টা শুকিয়েছে। পরে নিল। এক মুঠো কাঠকয়লা ছড়িয়ে দিল মালসায়। কাঠি দিয়ে আগুন খুঁচিয়ে দিলো। আবার জয়নাল ব্যাপারীর কথা মনে পড়লো। প্রথম রাতে হুকো টানতে টানতে ঘরে ঢুকেছিল বুড়ো। হাত ধরে প্রায় কোলের উপর বসিয়ে ছিল। গাল টিপে আদর করেছিল। শুকনো লম্বা আঙুলগুলো দিয়ে সারা শরীরটা ঘেঁটে ছিল যথেচ্ছ ভাবে। ঠিক সেই সময়টা শির শিরে কাঁপন লেগেছিল মনে। প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে অসহ্য ভালো লাগা উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছিল। সাময়িক ভুলে ছিল নিজেকে। ভুলে গিয়েছিল বুড়ো ব্যাপারীর একমাথা সাদা চুল, লোল চর্ম, শুকনো আঙুল। সবলে জড়িয়ে ধরেছিল তাকে আঠার মত। আগুনের হলকার মত উষ্ণ টুক্‌রো টুক্‌রো নিঃশ্বাসগুলো ছড়িয়ে দিয়েছিল ব্যাপারীর বুকের সাদা লোমের অরণ্যে।

ঠিক সেই সময়—সেই আগুন ঝরা মুহূর্তে তাকে কোল থেকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল ব্যাপারী। হুকোটা তুলে নিয়ে দু'ঠো টান দিয়ে দু'পা এগিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিল: ঠিক হয়া থাকবু। বেচাল কাম যেনে না ছাখো।

প্রথম রাতের আশ্চর্য প্রেমালাপ নয়, তাকে শুধু সতর্ক করে দিতে চেয়েছিল ব্যাপারী। তারপর হুকো টানতে টানতে আর তসবী ঘোরাতে ঘোরাতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। সারা শরীরে এক অসহ্য ঘৃণার তীব্র স্রোত ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছিল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিটা চৌকাঠের বাইরে বার কতক পাঠিয়ে এক রকম ছুটে এসে দরজার পাল্লা দু'টো সশব্দে বন্ধ করে দেয়। পরমুহূর্তে বিছানায় এসে লুটিয়ে পড়ে এক সমুদ্র কান্নায়। সেই বিচিত্র রাতটা সে প্রায় জেগেই কাটিয়েছিল।

ব্যাপারীর সেই ইংগিতের অর্থ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল কদিনের মধ্যে। শুনে প্রথমে সে প্রায় বোবা হয়ে গিয়েছিল। তারপর,—সেই মুহূর্তের নির্বাকতা ঝেড়ে ফেলে সে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। আর ঠিক তখনই বুঝি বুকের মাঝে ছাইচাপা বিদ্রোহী আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। সেই আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবার ইচ্ছেটা ক্রমেই দানা বেঁধে উঠেছিল মনে মনে। আর তাই ষোড়শী মনের রিক্ততা ভরাতে, এক অফুরন্ত ক্ষিধে মেটাতে বাঁকা পথ বেছে নিয়েছিল ইমানদার জয়নাল ব্যাপারীর পাঁচকুড়ি টাকার নিকা করা বিবি ছমিরন্নেষা।

একটা অস্পষ্ট হাসির মৃদু ঢেউ ছোট্ট অসমান্তরাল রেখা টেনে গেল ঠোঁটের প্রান্তে। বৃষ্টিটা বোধহয় একটু কমেছে।

ব্যাপারীর জমি 'আধি' (ভাগ চাষ) করতো রমজান। ফাই ফরমাস খাটতো সংসারের। তাই বাড়ীর ভেতরে অবাধ প্রবেশ অধিকার ছিল তার। দু'চারবার তাকে লক্ষ্যও করেছে ছমিরণ। পঁচিশ বছরের তাজা চেহারা। নিটোল পেশী বহুল শরীর। পরনে খাটো লুঙ্গি, কাঁধে গামছা। রমজান যখন জলপান অথবা গুয়াপান খেতে আসতো অন্দর মহলে, ঘোমটার ফাঁক দিয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার রোমশ বুক, কোমর, পায়ের গোড়ালী দু'টো পর্যন্ত খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতো সে। শিরশির করে উঠতো সারাটা দেহ। কামারের হাপরের মত ফুলে উঠতো আঁচল চাপা বুকটা। এবং ক্রমশঃ সেটা যেন নেশায় দাঁড়িয়ে গেল। রমজান এলেই সে প্রায় ছুটে এসে দাওয়ায় দাঁড়াত। রমজানও একগাল হেসে দু'পা এগিয়ে এসে মুখের দিকে চেয়ে বলতোঃ একনা গুয়াপান দ্যান, নয়া বিবি।

ওর প্রসারিত হাতের পাতায় এক ফালি পান আর এক টুকরো কাঁচা সুপুরি ফেলে দেবে সে। বুকের মাঝখানে মৃদু কাঁপন জাগে। বুঝতে পারে, রমজান আড়চোখে বক্র দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে আঁচল ঢাকা বুকের দিকে। দ্রুত আঁচল টানতে যেয়ে পুরোটাই প্রায় বেসামাল হয়ে পড়ে। মুহূর্তে গাল দুটো রক্তরাঙা হয়ে ওঠে। দৃষ্টি হয় আনত। দাঁত দিয়ে

সুপুরি চিবুতে চিবুতে মুচ্‌কি হেসে বিদায় সম্ভাষণ জানায় রমজান : চনসু নয়া বিবি।

আইসেন। অস্ফুট কণ্ঠে জবাব দেয় সে।

রংপুর জেলার সবচেয়ে বড় মেলা,—বদরগঞ্জের পৌষ মেলা। পুরো একমাস ধরে চলে। সেবারে মেলায় দোকান দিয়েছিল জয়নাল ব্যাপারী। পুরো মাসটা সে অনুপস্থিত ছিল বাড়ীতে। সমস্ত দায়িত্ব ছিল রমজানের ওপর। পাহারাদার রূপে তাই তাকে রাত্রে থাকতে হত। মাদুর পেতে দাওয়ায় শুতো সে। ঠিক তার দরজার সামনে। সবাই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লেও সে ঘুমাতো সব চেয়ে দেরীতে। খুলি (উঠোন) তে পোয়াল (খড়) জ্বেলে আগুন পোয়াতো বসে বসে। আস পাশ থেকে কোন কিছুর শব্দ কানে এলে প্রায় চীৎকার করে বলে উঠতো : কাঁয়, কাঁয় হে ?

বিছনায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে সেও স্পষ্ট শুনতো রমজানের চিৎকার। অন্ধকার ঘরটায়, একটা একান্ত অসহায় অবস্থার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে সে ক্রমে হাঁপিয়ে উঠতো। সেই অবস্থা থেকে সাময়িক মুক্তি পেয়ে সে কখনো খাটের ওপর উঠে বসতো। অহেতুক পৌষের কনকনে শীতের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেত। জানলা খুলে হিমেল হাওয়া গায়ে মাখতো। দরজার খিল খুলতে যেয়ে হাতটা যেন হঠাৎ পাথরের মত ভারি হয়ে উঠতো। প্রতিটি প্রহরের নিঃসঙ্গতা যেন তাকে প্রায় ক্ষিপ্ত করে তুলতো।

পাশের ঘর বড়বিবির। ঘরে তালা, কারণ তিনি নাইওর (বাপের বাড়ী) গেছেন। তারপর মেজবিবির ঘর। মাস তিনেক ধরে ম্যালেরিয়ায় শয্যাগতা। প্রতি রাত্রে তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। প্রায় বেহুস হয়ে বিছানায় পড়ে থাকেন। রুগী সাহায্যকারিনী রূপে মেঝেতে কাঁথা মুড়ি দিয়ে নাক ডাকে বুড়ী আইনুদ্দির মা।

ব্যাপারীর অনুপস্থিতিতে সামান্য কটি দিনের ভেতরে ওরা বেশ কিছুটা সহজ হয়ে উঠেছিল। জড়তা কেটে গিয়েছিল,—সরমের সীমা-রেখা অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে এসে ছিল ছমিরন্নেষার। মাঝে মাঝে

বক্রদৃষ্টিতে দেখতে বুড়ী আইনুদ্দির মা ভয় ভয় করতো তার।

স্পষ্ট মনে আছে সে রাতের স্মৃতি। মনে হয় যেন কটি মুহূর্তের আগের ঘটনা। তীব্র ঠাণ্ডা পড়েছিল সে রাতে পৌষের শীত। তার ওপর ঘন কুয়াশার পর্দা। দু'হাত দূরের কিছু নজরে পড়ে না। হিমেল বাতাস যেন গায়ে দাঁত বসাতে চায়,—চোখ মুখ জ্বালা করে।

সাঁঝ বেলা খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে গিয়েছিল আলুভত্তা (সেদ্ধ) ভাত আর শোল মাছের সুরুয়া (ঝোল) রেধেছিল সে। মেজবিবির জন্য এক বাটি শটীর পালো। সে রাতে তার জ্বর খুব বেড়েছিল। প্রায় বেহুস হয়ে বিছানায় পড়েছিলেন তিনি। মেঝেতে কাঁথা মুড়ি দিয়ে কুঁকড়ে শুয়েছিল আইনুদ্দির মা। সবশেষে নিজে দু'টো মুখে দিয়ে শুয়ে পড়েছিল সে।

উঠোনে আগুন জ্বেলে হাত-পা সেঁকৃতে বসেছিল রমজান। কান দু'টো পেঁচিয়ে নিয়েছিল গামছা দিয়ে। আর বিড়ি ফুঁকে চলছিল একটার পর একটা। দৈনিক একমুঠা (প্যাকেট) বিড়ি বরাদ্দ ছিল তার।

বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছিল সে। আচমকা ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। বাইরে তারস্বরে শেয়াল ডাকৃছে। মধ্যরাত। উঠতে হল প্রাকৃতিক কারণে।

খুক্ খুক্ খুক্। কাশির শব্দ। রমজান এখনো জেগে আছে। দরজা খুলতেই একঝলক হিমেল হাওয়ায় ঝাপটা এসে ছড়িয়ে পড়লো সারাটা মুখে। গোটা শরীরটা মুহূর্তে কেঁপে উঠলো থরথর করে। তখনও আগুনের ধারে বসে রমজান। কুয়াশায় আবছা দেখা যাচ্ছে তার শরীরটা।

বোধহয় একমুঠো শুকনো পাতা সে ফেলে দিল অগ্নিগর্ভে। চির-বিড় করে শব্দ হলো। পরমুহূর্তে মুঠো মুঠো লালচে আভা ছড়িয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। বেশ কিছুটা স্থান জুড়ে গন গনে আঁচ হয়েছে। টকটকে লাল রং ছাই চাপা পড়তে খুঁচিয়ে আগুন বের করছে সে। মিঠে তাপে গরম করে নিচ্ছে শরীর।

চৌকাঠ ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সে। কপিশ চোখে চেয়ে দেখলো রমজানের আবছা শরীরটা চুঁয়া (কূয়া) পার থেকে ঘুরে এল হাতে পায়ে জল ঢেলে। দাওয়ায় উঠে,—ঘরে ঢোকবার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে কাশলো, খুক্ খুক্ খুক্। কাশির শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করে রমজান: কাঁয়?

মুই। প্রায় অস্পষ্ট স্বরে উত্তর দেয় সে।

আগুনের ধার থেকে উঠে এল রমজান। দাওয়ায় একটা একটা পা তুলে চাপা কণ্ঠে বললে: এলাও (এখনও) নিঁদ যান নাই!

টুট (ভেঙ্গে) গেল।

কেনে? দাওয়ায় উঠে পঠে পড়ে সে। প্রায় গা ঘেসে এসে দাঁড়ায়। চোখের তারায় আগুনের হলকা।

যানো না। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে, কোমর ঘুরিয়ে, দৃষ্টির একটা তীব্র প্রশ্ন বাণ হেনে চৌকাঠের সীমা ছাড়িয়ে ঘরে পা রাখে সে। দরজার পাল্লাদুটো যেন খাঁ করে থাকে ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মত। ঘরের কোণে কেরোসিনের ডিবেটা জ্বলছে মিটমিট করে, উগ্র গন্ধ আর কালো ধোঁয়া জড়িয়ে শিখাটা কাঁপছে এলোমেলো হাওয়ায়। পৌষের শীত যেন চৈত্রের দাহ আনে দেহে মনে। রমজান চৌকাঠের নিষিদ্ধ সীমানার গা-ঘেসে এসে দাঁড়িয়েছে। বেকুফ্,—পরণের শাড়ীটা একটানে খুলে ফেলে সে। বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রয়ে ছুটে এসে ওর হাতটা সজোরে চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে সাপের মত হিস্‌হিসিয়ে বলে: আইসেন—

চৌকাঠের পাল্লা বন্ধ হয়ে যায়। ওদের গিলে ফেলে শুক্‌নো পাতার মর্মর শব্দ হয়। ডানা ঝাপটানের আওয়াজের সাথে তীব্র চিৎকার। মুরগী ধরেছে খেঁকশেয়ালে।

বৃষ্টি আরো জোরে শুরু হয়েছে। ছিঁয়ালু আরও কুঁক্‌ড়ে শুয়েছে। মাঝে মাঝে কেশে উঠছে—খুক্ খুক্ খুক্। ঝিমুনি আসছে। একমুঠো কয়লা ছিটিয়ে দেয় মালসায়। ক্ষিদেয় মুখ দিয়ে থুথু উঠছে। কিন্তু খাবার বাড়ন্ত ঘরে। ছিঁয়ালু কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে ডাক্‌ছে: শুনি যা—

কেনে ?

ইতি আয়। হিঁয়ালু কাছে ডাকছে। উটে আসে শিওরের কাছে। কপালে হাত রাখে। ঘাম হচ্ছে—জ্বর ছাড়ছে এবার।

খাছিস ? জিজ্ঞেস করে হিঁয়ালু।

কি খামো ? পাল্টা প্রশ্ন করে ছমিরণ। নিরুত্তর হিঁয়ালু। খুক্ খুক্ খুক্। কেশে ওঠে। পাশ ফিরতে ফিরতে বলে সে: আমচরণ ('র' স্থলে 'অ' উচ্চারণ করে) আইছে ?

না—জবাব দেয় ছমিরণ। আর কোন কথা বলে না হিঁয়ালু। কিছুটা সময় চুপচাপ কেটে যায় কাঁথাটা ঠিক করে টেনে দিয়ে আবার এসে বসে আগুনের মালসার ধারে। বৃষ্টির তেজ আরও বেড়েছে; থেকে থেকে আহত বাঘের মত মেঘ গর্জাচ্ছে। ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে জল ঢুকে পড়ে দোর গোড়াটা কাদা কাদা হয়ে গেছে। গোটা কতক কেঁচো উঠে এসেছে। কে যেন ডাক দিল। চমকে ওঠে সে। দ্বিতীয়বার শোনবার জন্য কান ও মন সজাগ করে। না—মানুষ নয়। হাওয়ার ঝাপটা লাগছে বাঁশের বেড়াতে। তাই শব্দ হচ্ছে। তাছাড়া কেইবা আসবে এ সময় ? এক রামচরণ—হিঁয়ালুর বন্ধু। সে এখন কোথাও গাঁজার নেশায় মসগুল। নয়তো কোন বেটীছাওয়ার সঙ্গ সুখে বিভোর।

বেশ শীত করছে। বিশের তাজা রক্তে কাঁপুনি ধরেছে। এমনি এক বিচিত্র কাঁপন জেগেছিল রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে, দেহের প্রতিটি সমতল অসমতল প্রান্তে। রমজানের বিশাল বুকের আড়ালে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। সোদনগুলো আজও মনে পড়ে গতকালের মত।

পৌষ মাস শেষ হতে মাত্র সাতটা দিন বাকী ছিল। অঘটনটা তারি মাঝে ঘটে গেল। ধরা পড়ে গেল তারা: সেই অতি নিষ্ঠুর রাতটা। আজও স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সে আর রমজান পাশাপাশি শুয়েছিল। মধ্যরাতের আবেশ গভীর ঘুমে ভরিয়ে দিয়েছিল দু'জনকে। ঘুম ভাঙলো শেষরাতে। ঊষার আলো যখন সবে রাতের আঁধারকে মুছে দিতে শুরু করেছে। উনুন ধরানোর জন্য দেশলাই চাইতে এসেছিল আইনুদ্দির মা। দরজা ঝাঁকিয়ে ঘুম ভাঙিয়েছিল।

রমজানকে ঘর থেকে মাথা হেঁট করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখও বুড়ী নিশ্চুপ ছিল। হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা নিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে কি যেন বিড় বিড় করে বলে উঠেছিল। আর ভয়ে সে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দরজার পাল্লা ধরে দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ।

মুখবন্ধ রাখতে ঘুষ দিতে হয়েছিল আইনুদ্দির মাকে। ফোক্লা দাঁতের ফাঁকে বিচিত্র হাসির রেখা টেনে, ঝুলে পড়া চোখের পাতা দু'টো পিট্ পিট্ করতে করতে হাত পেতে নিয়েছিল বুড়ী, দশটা টাকা আর নোতুন তাঁতের শাড়ীটা। আর ব্যাপারী বাড়ী ফিরতেই কথাটা কানে তুলে দিয়েছিল একটি মুহূর্ত দেরি না করে।

কথাটা শোনামাত্র একটা পৈশাচিক চীৎকার করে তাকে ডাক দিয়েছিল ব্যাপারী। সাথে সাথে ছুটে ঘরে ঢুকেছিল এক পাটি খরম হাতে করে। প্রহারের পালটা চলেছিল বেশ কিছুক্ষণ, এলো পাথড়ি— যতক্ষণ রক্তাক্ত অচৈতন্য হয়ে সে মেঝেয় না লুটিয়ে পড়েছিল। তারপর পুরো তিনটে দিন সম্পূর্ণ অভুক্ত অবস্থায় ফেলে রেখেছিল। পনের দিন পর সে উঠে বসতে পেরেছিল। ইতিমধ্যে রমজানেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল অন্দরমহলে। তার ঠাঁই নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল বাইরের একটা ছাপরায়। সেইরাতে প্রায় মরিয়া হয়ে টলতে টলতে গোপনে সে দেখা করেছিল রমজানের সাথে। অনুরোধ জানিয়েছিল: এখান থেকে পালে নিয়া চলেন মোক—

আরে ববাপ! ব্যাপারী কাটি ফ্যালাইবে! ভয়ে গলার স্বর প্রায় বুজে আসছিল রমজানের। জবাব শুনে চোখ দু'টো মুহূর্তে জ্বলে উঠেছিল। মুঠো মুঠো ঘৃণা কণ্ঠনালি বেয়ে উঠে এসে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে উপছে পড়েছিল তার: তোঁরা মরদ না বেটীছাওয়া!

সেটা তো ভালো করি জানেন। রসিকতা করে উত্তর দিয়ে পাশ ফিরে শুয়েছিল রমজান।

অবশেষে ব্যাপারী তাকে তালাক দিয়েছিল। পবিত্র হারেম থেকে খবীজ জেনানাকে বিদেয় করে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে ছিল। খোদার মেহেরবানী হারাবার ভয় থেকে মুক্তি লাভ করেছিল। পুনরায় ফিরে

আসতে হয়েছিল তাকে চাচার সংসারে।

চাচা তমিজুদ্দি কিস্‌সান (জন মজুর) খাটে। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় তার। ছ'টি প্রাণীর খোরাক। তার ওপর বাড়তি এলো সে। চাচী যেন ক্ষেপে উঠলো। বিশেষ করে তার ওপর। খিস্তি খেউরের বন্যা বয়ে চললো। প্রায় সময়,—কারণে অকারণে। প্রতিবেশীরা প্রথম প্রথম আসতো, সহানুভূতি জানাতো। অবশেষে তারাও হাল ছেড়ে দিয়েছিল। অবশ্য এসব প্রায়ই চাচার অসাক্ষাতে ঘটতো।

এক একদিন চাচী ভিড় জমিয়ে ফেলতো। তার বীর এবং করুণ রসের প্রলাপে গোটা টারি (পাড়া) এসে জমতো। কেউ কেউ চাচীকে ক্ষেপিয়ে মজা দেখত। মৃদুস্বরে দু'একটা খিস্তি অথবা সরেশ মন্তব্যও ছুঁড়তো। লক্ষ্যটা বেশির ভাগ সে-ই হয়ে উঠতো।

কখনো কখনো গাঁজা খোর চাচাতো ভাইটা তাকে উদ্ধার করতো ভিড় ঠেলে হাত ধরে বাইরে নিয়ে আসতো। মৃদুস্বরে সান্ত্বনা দিত: মুই থাইকতে ভাবিত করিস না।

ভেবেই বা সে তখন কি করতে পারতো। মাথা গোঁজবার মত কোন আশ্রয় ছিল না। তাই একান্ত অসহায়ের মত চাচীর লাথি-ঝাঁটা মুখ সহ্য করতো। চাচাতো ভাইয়ের প্রচ্ছন্ন সহানুভূতির মর্ম সে কিছু দিনের মধ্যে ধরে ফেলেছিল। তাকে মূলধন করে সে কিছু রোজগার করতে চায়। চাচারও তাতে সমর্থন ছিল।

একদিন পরিস্কার অস্বীকার করে বসলো সে। ফলে শুধু দু'চারটে চড় থাপ্পড় পড়লো তাই নয়, চাচাতো ভাই জোর করে টেনে নিয়ে গেল পাট ক্ষেতে পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়লো দেহের ওপর অপ্রত্যাশিত ভাবে।

চাচী তখনো পাড়া মাৎ করে চেঁচিয়ে চলেছে: ওহো হো কতয় হামার সতীন বেটিছাওয়া রে—এবং সেদিনটার সেখানেই ইতি হলোনা। পরদিন রাতে হাজী সাহেবের উঠতি কাপ্তান ছেলেকে দেহ দিতে হলো। চাচাতো ভাই বাধ্য করলো। শুধু একরাত নয়,—ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিজেকে পণ্য রূপে সাজাতে হত প্রতি রাতে। চাচার দু'মাসের

অনুপস্থিতির সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগালো চাচী আর তার ছেলে। এ নরক থেকে মুক্তির কোন পথের হদিসই সে খুজে পেল না মনের কাছে। বুকের মাঝে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েও তার বহিঃপ্রকাশ হলো না। অব্যক্ত অন্তর্জ্বালায় সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত সে জ্বলতে লাগলো তিলে তিলে। এক সমুদ্র বোবা কান্না বুকে চেপে অদৃষ্টকে ধিক্কার জানালো।

চাচা ফিরে আসতেই কেঁদে লুটিয়ে পড়লো তার পায়ে। সব শুনে তিনি গুম হয়ে গেলেন। গামছা কাঁধে ফেলে সেই ধূলোপায়েই ছুটে বেরিয়ে গেলেন বাসা থেকে। ফিরলেন বেলা ডোবার পর অর্থাৎ সন্ধ্যেবেলা।

চাচাই মুক্তির পথসন্ধান দিলেন। হিঁয়ালুর সাথে 'নিকা'র ঠিক হলো। পুরোনো আলাপী চাচার। বৌ পালিয়ে যাওয়ায় পাত্রীর সন্ধান করছিল হিঁয়ালু। সেই সংবাদ শুনেই ছুটে গিয়েছিলেন চাচা। কথাবার্তা পাকা করে ফিরেছিলেন। চাচী প্রথমটা আপত্তি করেছিল। চাচাতো ভাইও বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সব আপত্তি ঠেলে ফেলে দেড় কুড়ি টাকার দেন-মোহর অঙ্গিকার করিয়ে হিঁয়ালুর সাথে তার নিকা দিয়ে দিলেন চাচা।

সে আজ দেড় বছর আগের ঘটনা। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন বুকচিরে বেরিয়ে আসে ছমিরণের। এই দেড়টা বছরে পুরো একটা দিনও সে শান্তিতে কাটাতে পারেনি। অভাব অনটন উৎপীড়ন, তার ওপর স্বামীর পাশবিক ক্ষুধা। হিঁয়ালুর বৌ পালানোর কারণটা সে নিকে হবার চার পাঁচদিনের মধ্যেই হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরিছিল। পান থেকে চুণ খসলেই অমানুষিক প্রহার করত হিঁয়ালু। ন্যায় অন্যায় বিচারবোধ ছিল না। সহ্যের সীমা অনেকদিন ছাড়িয়ে গেছে। সময় সময় অসহ্য মনে হয়েছে। এ অত্যাচার—এই অসহণীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছে। কতবার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়েছে। সংকল্প করেছি মনে মনে কিন্তু কোথায়? কোথায় সেই নিরাপদ নির্ভরযোগ্য নির্দিষ্ট ঠিকানা। অসহায়ের মত এক একবুক জ্বালা নিয়ে গুমরে গুমরে

মরছে সে।

মালসার আগুন নিভে আসছে। ছাই এর আস্তরণে ক্রমে লাল রং ঢেকে যাচ্ছে। বসে থেকে থেকে পিঠ কোমর টন্‌টন্‌ করছে ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে,— গলা, ভিজ, ঠোঁট ক্রমশঃ শুকিয়ে আসছে। বৃষ্টি আরও বেড়েছে। চোখ জ্বলছে, ঢুলুনী আসছে। গভীর অবসাদে সারা শরীরটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। মালসায় আর একমুঠো কয়লা ছিটিয়ে সেটা হাতে নিয়ে উঠে পড়ে। মাচাং এর নিচে রাখে মালসাটা। সন্তর্পণে মাচাং-এ উঠে কাঁথার একটা ধার তুলে শরীরটা প্রায় গুটিয়ে ফেলে।

ভোর হ'ল। চৌধুরীবাড়ীর মোরগগুলো প্রায় একসাথে ডেকে ওঠে। মোয়জ্জিমের আজানের সুর ভেসে আসে। উঠে পড়ে ছমিরণ। হিঁয়ালু গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ঝাঁপের দরজা খোলে। পুব-আকাশে ছোপ্‌ ছোপ্‌ লালিমা। পরিস্কার নীল নীল মেঘ। হাওয়ায় জোলো গন্ধ। গাছপালাগুলো বৃষ্টিস্নাত। কিছুটা এলোমেলো। পথ কর্দমাক্ত। ছিংছিরে জল জমে রয়েছে মাঝে মাঝে। অসংখ্য কেঁচোর অবাধ গতি। খড়ের চাল ভিজে ফুলে উঠেছে। বিশ্রী গন্ধ বেরোচ্ছে। রাস্তার পাশের সরু নালাটা দিয়ে জলের স্রোত বয়ে চলেছে। একটা কোলা ব্যাঙ লাফ দিয়ে জলে পড়লো। ঝপ করে শব্দ হ'ল। 'খুলি' (উঠোন) তে পা রাখলো সে। স্পষ্ট ছাপ্‌ পড়লো মাটির বুকে। সোদা গন্ধ হাওয়ায়। চারপাশে চোখ দু'টো ঘুরিয়ে আনলো সে। হঠাৎ ঘটে যাওয়া বিশৃঙ্খলা,—গতরাতের ধর্ষিতা ধরিত্রী যেন আজও কিছুটা বিবস্ত্রা। শুপুরি পাতার ঝাঁটা দিয়ে দোর গোড়ার জমে থাকা জল বের করে দিল সে। মালসার ছাই এনে ছড়িয়ে দিল সেখানে। বাইরে রোদ উঠছে,—পরিস্কার সোনালী মুঠো মুঠো রোদ। চৌধুরী বাড়ীর মুরগীগুলো খুলিতে এসে ডানা ঝাপ্টাছে। এক টুকরো কাঠ কয়লা মুখে ফেলে দাঁত দিয়ে দিয়ে চিবোতে চিবোতে 'চুয়া' (কুয়ো) পারে এল সে। 'টাঁরী'র (মহল্লার) বৌ-ঝিরাও এসে জমেছে। কাজের সাথে চল্‌ছে মেয়েলী জটলা। টুকরো টুকরো কথা ভাসছে হাওয়ায়।

এ্যালায় (এখন) নিঁদ্ যেকি উঠলেন বুঝি ? শান্‌কিটা (মেটে থালা) ধুতে ধুতে মুচ্‌কী হেসে বললে নয়া মিঞার চোদ্দ বছরের বোন গিনি।

ছুড়ী তোরও দিন আসিল্ (এল) বলি,—গিনির উদ্দেশ্যে রসিকতা করে উঠলো রহিমুদ্দির বৌ। তার কথা শুনে সবাই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। মুহূর্তে রক্তিম হয়ে ওঠে গিনির দুটো গাল। কালো চোখের পাতা দু'টো কেঁপে ওঠে তিরতির করে। দৃষ্টি হয় আনত। ঘড়াটা কাঁখে তুলে সে প্রায় ছুটেই পালায়।

চোখে মুখে জলের ছিটে দেওয়ার সাথে সাথে হিঁয়ালুর হেঁড়ে গলার চীৎকার কানে আসে : কোঠে (কোথায়) গেলু ?

যাও—উচ্চকণ্ঠে সাড়া দেয় ছমিরণ। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে প্রায় ছুটে আসে ঘরে। মাচাং এর ওপর উঠে বসে বিড়ি টান্‌ছে হিঁয়ালু। ওকে দেখে বলে : ভোক্ (ক্ষিধে) নাইগছে। পন্তা টন্তা কিছু আছে নাকিন ?

না।

কেনে। আইতে (রাতে) ভাত আঁধিস্ (রাধিস্) নাই ? ওর কথাগুলো সারা শরীরে জ্বলুনি ধরিয়ে দেয় ছমিরণের। স্পষ্ট জানে গতকাল থেকে ঘরে চাল বাড়ন্ত। এ যেন কচি ছেলের আব্দার! একটা কটু কথা প্রায় জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল। সেটা সামলে নিয়ে শ্লেষের সুরে বললে সে : ঘরে ধান চাউলের গোলা আখি (রাখি) দিছেন যে!

শালীর কথা শুনইলে গাও জ্বলি যায়। মাচাং থেকে নামতে নামতে দাঁত চেপে বলে হিঁয়ালু।

হক্ কথা কইলে তো—

মুখ ভাঙি ফেলাইম বড় বড় কথা কইলে। একটা পাশবিক চীৎকার করে ওকে থামিয়ে দেয় হিঁয়ালু। রাগে চোখের মণি দুটো জ্বলে ওঠে ছমিরণের। ক'টি মুহূর্ত ক্রুদ্ধ স্থির দৃষ্টিতে হিঁয়ালুর চোখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর ঘুরে অতি দ্রুত পা বাড়ায় ঘর থেকে

বেরিয়ে যাবার জন্য।

কোঠে (কোথায়) যাইস? পেছন থেকে প্রশ্ন করে হিঁয়ালু। জবাব না দিয়ে সে আরও কয়েক পা এগিয়ে যেতেই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে হিঁয়ালু: নবাবজাদীর কথা কানে যায় না নাকিন?

মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে অনলবর্ষী দৃষ্টি নিয়ে স্পষ্ট জবাব দেয় সে: নবাবজাদী হইলে কি আর একটা কিস্‌ষাণের (কিষাণ) সাথে নিকা হয়!

ওহো হো বাদশা বসি আছলো তোর নাগি। ব্যঙ্গ করে হিঁয়ালু।

ক্ষোভে দুঃখে চোখে প্রায় জল এসে যায় ছমিরণের। বুকের ভেতরটা গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে। কত শত কথার সমুদ্র ফেনিয়ে ওঠে কণ্ঠে। সে যেন বোবা হয়ে যায়। সচল দেহটা পরিণত হয় নিশ্চল পাষাণে।

মানুষের আকৃতি ছাড়া মনুষ্যত্ব বোধের কণা মাত্র অবশিষ্ট নেই হিঁয়ালুর মাঝে। পশু, হিংস্র—নির্মম—স্নেহ প্রীতি এসব কিছুরই বোধ নেই তার কাছে। আছে শুধু প্রয়োজনের সম্পর্ক। না হলে সাত সকালে পুরো দু'দিনের অভুক্ত একটা মানুষের সঙ্গে কেউ এরকম ব্যবহার করে? মেয়েমানুষ কি মানুষ! শুধু দৈহিক প্রয়োজন ছাড়া সে কি এতই অপ্রয়োজনীয়? পশু—পশু—পশু এছাড়া হিঁয়ালুর আর কোন সংজ্ঞা নেই ছমিরণের কাছে।

বিড়িটায় শেষ সুখ টান দিযে ছুঁড়ে ফেলে বলে হিঁয়ালু: চৌধুরী বাড়ী হতে চাউল ধার চায়া আন।

পারিম না। দৃঢ় কণ্ঠস্বর ছমিরণের।

কেনে? কয়েক পা এগিয়ে আসে হিঁয়ালু।

চৌধুরীর ছোট ছাওয়াটার অকম-সকম ভালো নয়।

তোর থেকিও—?

হিঁয়ালুর ইংগিত মনে বৃশ্চিক জ্বালা ধরিয়ে দেয়। নিজেকে আর সামলাতে পারে না। সাপের মত হিস্‌হিসিয়ে ওঠে কণ্ঠস্বর: মুখ সামলি কথা কন।

কি কলু? শালীর এত তাও—ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত হিঁয়ালু প্রায়

ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর। চুলের মুঠো ধরে এক হ্যাঁচ্কা টানে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর অশ্রাব্য খিস্তির সাথে চলে এলোপাথাড়ি কিল চড় লাথি। কাটা পাঁঠার মত ছট্ফট্ করে ছমিরণ। সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে পড়ে। চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। সারা মুখটা গুলি গুলি হয়ে ফুলে ওঠে। খড়মের ঘায়ে কপাল কেটে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। তারপর সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

চীৎকার শুনে প্রতিবেশী নারী পুরুষ কয়েক জন ছুটে আসে। তার আগে হিঁয়ালু বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। মেয়েরা পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে। রহিমুদ্দির বৌ তাড়াতাড়ি খুলে যাওয়া ছ্যাওটাটা পেঁচিয়ে দেয় কোমরে। গিনি মাথাটা কোলে তুলে নেয়। আর একজন একছুটে বেরিয়ে গিয়ে কিছু গাঁদা ফুলের পাতা ছিঁড়ে আনে। থেঁতো করে তার রস দেয় কপালের কাটা জায়গায়। ন্যাক্ড়া ভিজিয়ে মুখ আর রক্তের দাগ পরিস্কার করে গিণি। যেন সম্পূর্ণ তার অজান্তে কাঁপা কাঁপা স্বরে বেরিয়ে আসে শুধু একটি কথা: ভাতার না আজরাইল (যমদূত)।

মাত্র দু'টো দিনের পরের ঘটনা। হিঁয়ালুর জীবনে সব চেয়ে বড় দুর্ঘটনা! সারাদিন বাড়ী ছিল না সে। কাজে বেরিয়েছিল। ফেরবার পথে বাজার করে এনেছিল গামছায় বেঁধে। চাল ডাল নুন ছাঁচি (সরষে) তেল আর পাটা (পাট) শাক। বেলা ডোবার বেশ কিছুটা পরে সে ঘরে ফিরল। ঝাঁপ খোলা। ঘর শূণ্য! অন্ধকার ঘরটার মাঝে দাঁড়িয়ে থেকে মৃদু কেশে সে নিজের উপস্থিতি জানালো। কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর শোনা বা বোঝা গেল না। হাতের পোঁটলাটা নামিয়ে রাখলো। হাতড়ে হাতড়ে সিঁথানের (শিওর) নিচ থেকে দেয়াশলাই বার করে কুপি জ্বাললো। স্পষ্ট দেখলো ঘরে নেই ছমিরণ। কোথায় গেল! বেরিয়ে এসে চিৎকার করে ডাক্লো: কোঠে গেলু উ?

কোন উত্তর এলোনা সে ডাকের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোটা দুই বিড়ি শেষ করলো সে। তারপর কয়েক পা এগিয়ে আশ পাশের বাড়ীতে খোঁজ নিল। কোন বাড়ীতে সে আসেনি। কেউ দেখেনি তাকে। খানিকটা দুঃশ্চিন্তায় কপালের শিরাগুলো কুঁচকে ওঠে। চাচার

বাড়ীর কথা মনে হতেই সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছে শোনে, ছমিরণ সেখানেও নেই। চাচার ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সামনে হিঁয়ালু যেন গুটিয়ে আসে। ভয় পায়, স্রেফ্ পালিয়ে আসে। সবাই মিলে আশ্ পাশের বন বাদাড় চষে ফেলে। বিলের চারপাশ কলার ভুরা (ভেলা) ঠেলে খোঁজে। কালো জলের বুকের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে—যদি লাসটা ভেসে ওঠে!

সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। কোন খোঁজই পাওয়া যায় না—জীবিতা অথবা মৃতার।

হারিয়ে যায় দিন একের পর এক। পেরিয়ে যায় মাসের পর মাস। ঋতু বদলায়। ছমিরন্নেষার কথা চাপা পড়তে পড়তে মানুষ প্রায় ভুলতে বসে। কিন্তু নিঃশেষে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনা শুধু হিঁয়ালু। ক'টাদিন পুলিশের টানা হ্যাঁচড়ার কথা মনে পড়লেই রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে তার। ইতিমধ্যে সে আবার নিকে করে বৌ এনেছে ঘরে। কিন্তু রামচরণ ভুলতে পারেনি। গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকবার সময়ও হঠাৎ মনে পড়ে বৈকি! ব্যথায় টনটন করে ওঠে বুকটা। মানুষটাকে বড্ড ভালো লেগেছিল তার। ছমিরণও তাকে ভালোবাসতো ঠিক সহোদরের মত। দু'জনের মাঝে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাই মাঝে মাঝে রামচরণের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে গভীর দুঃখে: কোঠে গেল মানুষটা···

চুপ থাক্ রামচরণ। ধমকে কথাটা চাপা দেয় হিঁয়ালু।

অগ্রাণ মাস। নোতুন ধান উঠেছে। 'নবান' (নবান্ন) সারা হয়েছে ঘরে ঘরে। বাড়া বানা (ধান ভাঙা) শুরু হয়েছে। চাষীর ঘরে খুশীর আমেজ। নোতুন পোয়াল (খড়)-এ খুলিতে আগুন জ্বলছে। আগুনের চারপাশ ঘিরে বসেছে টাঁরীর মেয়ে পুরুষেরা। বাচ্চারা আগুনে পুড়িয়ে খাচ্ছে 'শাখালু' (মিষ্টি আলু)। পচা গীদালের (গায়ক) দোত্রার তারে মিষ্টি সুর। দরাজ গলায় গান ধরেছে গীদাল,—

"কন্যার মুখত্ হাসি চোখত্ সরম
ক্যাশত্ গোঞ্জা ফুল।"……

আগুনের মিঠে তাপ আর পচার গানে বিভোর হয়ে পড়েছে সবাই। গানের কলি শুনে অনূঢ়ারা গা টেপাটেপি করছে পরস্পরের। কেউ বা হাসি চাপছে মুখে আঁচল গুজে। দোহার ছোঁড়াটা তালে তালে দ্রুতলয়ে নির্ভুল করতাল বাজিয়ে চলছে। গানের শেষ পর্দটায় কণ্ঠ মিলিয়ে সরু গলায় গেয়ে উঠ্ছে। বিড়ি তামাক পুড়ছে সমানে। হিঁয়ালুও মশগুল হয়ে বসে আছে। আগুনের লাল আলোয় ওর মুখ দেখাচ্ছে। চোখ বুজে গান শুনছে সে। তালে তালে মাথা নাড়ছে। এমন সময় বাইঙ্কা হাতে রামচরণ এসে হিঁয়ালুর পেছনে দাঁড়ালো। ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখে কিছুটা সরে বসবার জায়গা দিয়ে হিঁয়ালু জিজ্ঞেস করলো: হাট থেকে আলু?

হয়। বসে জবাব দেয় রামচরণ।

এত আইত (রাত) হইলে যে? নে ধর। একটা বিড়ি দিলো হিঁয়ালু। বিড়িটা ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে হুস করে শব্দ করে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লো রামচরণ। হাত দু'টো সেঁকে নেয়। মাথায় জড়ানো গামছাটা ঠিক করে। পচার গান তখনো চলছে। গানটা শেষ হতেই নির্বিকারভাবে রামচরণ বলে ওঠে: ভাবীক্ (বৌদি) দেখি আইনো (এলাম)।

কাক্! (কাকে) হিঁয়ালু যেন চমকে ওঠে।

কথাটা শুনে প্রত্যেকটি মানুষের দৃষ্টিতে গভীর বিস্ময় ফুটে ওঠে। উৎসুক হয়ে ওঠে সকলে। এবং নির্ব্বাকতা মুহূর্ত্তে ঝেড়ে ফেলে সবাই যেন একই প্রশ্ন করতে চায়। বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিয়ে উঠে ভারীগলায় রামচরণকে প্রশ্ন করে হিঁয়ালু: কোঠে দেখি আলু?

আলমনগর। বেশ্যা টাঁরীত ঘর নিছে—

খরীজ বেটীছাওয়া (বদমাশ মেয়েছেলে)। দাঁত চেপে বলে হিঁয়ালু।

আসরটা যেন নিঃস্তেজ হয়ে পড়ে। আবহাওয়া ভারি হয়ে ওঠে।

প্রতিটি আঁখির ভাষা ব্যথাভরা। করুণতার প্রতিচ্ছায়া প্রতিটি অবয়বে। পরিস্থিতির সাথে নিজেকে বড্ড বেমানান মনে হয় হিঁয়ালুর। এই গুমোট ভাবটা অতি অসহ্য লাগে। প্রতিটি মানুষ যেন ব্যঙ্গের দৃষ্টি দিয়ে তাকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করছে। ক্রমশঃ সে অসহায় হয়ে পড়ছে। এ পরিস্থিতি থেকে সে পরিত্রাণের পথ খোঁজে। চোখের তারা দু'টো জ্বলে ওঠে—অস্বাভাবিক কণ্ঠে তীব্র চীৎকার করে সে বলে : গীদাল, আমি গেলু কেনে ?

সেই চীৎকারে মানুষগুলো নড়ে চড়ে ওঠে। আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করে। তবু বিষাদের রেশটা থেকেই যায়। পচার দোতারায় আবার টুং টাং আওয়াজ ওঠে। রাতের নিস্তব্ধতাকে সুরের ঢেউয়ে ভাসিয়ে দিয়ে গান ধরে পচা গীদাল :

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে……

অগ্নিগর্ভ

পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রয়োজনীয় দু-একটা যন্ত্রপাতি প্যান্টের পকেটে পুরে টর্চটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে অমরেশ। খানিক আগে সকালের কাজে যাবার ভোঁ পড়েছে। মালকাটারা নেমে গেছে খাদে ; কামিনরাও পৌঁছে গেছে কয়লা লোডিংএর জায়গায়। বড় একটা মানুষজন চোখে পড়ে না।

দেরী হয়ে গেছে একটু। জোরে পা চালিয়ে দেয় অমরেশ। কয়লার গুঁড়ো মেশানো রাস্তার কালো ধুলায় ছড়িয়ে পড়েছে সকালের উজ্জ্বল রোদ। রোদ পড়ে চিকচিকিয়ে উঠছে কয়লার ছোট ছোট টুকরো। হীরের দ্যুতি ঠিকরে পড়ার মতো।

একটা সংশয় নিয়ে অফিসের দিকে এগিয়ে চলে অমরেশ। সংশয়টা ঠিক সময়ে হাজির হতে না পারার জন্য নয় ; কোয়ার্টালি বোনাসের টাকাটা পাওয়া চাই আজ-কালের মধ্যেই। বাড়ীতে কিছু টাকা পাঠান দরকার।

অফিসে পৌঁছে হাজারিবাবুর সঙ্গে দেখা করে বোনাসের কথাটা বলতে বড়বাবুর কাছে যায়। একজন মালকাটার সঙ্গে কী নিয়ে বচসা চলছে বড়বাবুর :

—এখানে চেঁচাবিনে। কাজ করতে যা বলছি।—চোখ পাকিয়ে লোকটিকে বলেন বড়বাবু,—নইলে নাম খারিজ করে দেব।

—হঁ যাছি। লোকটি নড়ে না। বলে,—মিস্তক হাসি বনাস পাব নাই ক্যানে—সেইটি বল।

তোকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে হারামজাদা।—রেগে বলেন বড়বাবু,—বলছি সে তিন মাসের মধ্যে যাট দিন কাজে হাজির থাকিসনি বলে

তুই বোনাস পাবি না—কানে যাচ্ছে না সেকথা ?

—ই-ট একদম মিছা কথা।—জোরের সঙ্গে বলে লোকটি,—তিন কুড়ি রলে বেশীদিন আমি হাজির দিয়েছি।

—ফের চেঁচাচ্ছিস! ডাকব সর্দারকে ?

লোকটি আর কথা বাড়ায় না। গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে যায়। শাসিয়ে যায়, লেবার অফিসারকে নালিশ করবে।

দাঁড়িয়ে শুনছিল অমরেশ। বড়বাবুর কথার প্রতিবাদ করার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। তাহলে হয়তো ওই লোকটার মতো ওকেও বড়বাবুর কারসাজিতে বোনাস থেকে বঞ্চিত হতে হবে। বোঝে সব, জানে সবকিছুই; কিন্তু মুখ বন্ধ করে থাকতে হয়। লোকটা ইউনিয়নের মারফৎ লেবার অফিসারকে নালিস করবে ঠিকই, হয়তো খোঁজও নিতে আসবে লেবার অফিসার। কিন্তু নকল হাজরি খাতা দেখে ফিরে যাবে। বলে যাবে, গরহাজির থাকার জন্য বোনাস পেতে পারে না লোকটা। প্রথম প্রথম আশ্চর্য লাগতো। এখন আর অবাক হয় না অমরেশ। জানে মজুরদের কাজের এবং আরও বিভিন্ন প্রকারের সুখ সুবিধা দিতে মালিক বাধ্য। কিন্তু পরিদর্শনে এসে কী এক অজ্ঞাত কারণে লেবার অফিসারকে সন্তোষজনক রিপোর্ট পাঠাতে হয়। গভর্নমেণ্টের কাছে। অথচ কুলি-কামিনরা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই পড়ে থাকে। শেষে ইউনিয়নের নেতার কথা শুনে একেবারে চুপ করে যায়। কেবল নিষ্ফল আক্রোশ মনে মনে ফুঁসতে থাকে, আর কেউ-বা ধিক্কার দেয় নিজের ভাগ্যকে।

লোকগুলোর জন্য মায়া হয় অমরেশের।

—কিহে, তোমার আবার কি খবর ?—অমরেশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন বড়বাবু।

—আমারও ঐ বোনাসের ব্যাপার।—মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে অমরেশ। বড়বাবু একটু গম্ভীর হয়ে পড়েন,—বিল হচ্ছে। হলেই পাবে।

—বলছিলাম কি,—একটু ইতস্তত করে বলে অমরেশ,—একটু

তাড়াতাড়ি হলে ভাল হয়, বাড়ীতে পাঠাতে হবে।

—কেন, এ-মাসে টাকা পাঠাওনি বাড়ীতে ?—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটাকে সরাসরি অমরেশের চোখের ওপরে ফেলেন বড়বাবু,—মেসের খরচ ছাড়া আর তোমার কোন্ খরচ আছে বলতো শুনিনি। না, উড়ছো আজকাল ?

বড়বাবু ইঙ্গিতপূর্ণ কথায় লজ্জা পায় অমরেশ। রাগও হয় মনে মনে। বড়বাবু কি সন্দেহ করেছেন, এর-তার মতো ও'-ও ফুর্তিতে মেতেছে ? যদিও দু'বছর ধরে দেখছে অঢেল সুযোগ রয়েছে এখানে ফুর্তি মারার। বয়স এবং চেহারার জন্য সুযোগ এসেছিলও কয়েকবার, কিন্তু প্রবৃত্তি হয়নি অমরেশের। তাই মোটামুটি সকলেরই সুনজর রয়েছে ও'র ওপরে।

ইচ্ছে হ'ল বেশ কড়া জবাব দেয়। কিন্তু তাতে হয়তো বিপরীত ফল হতে পারে। তাই সংযত ভাবে বলে,—আজ্ঞে হ্যাঁ, পাঠিয়েছিলাম। কালকে মা আবার চিঠি দিয়েছে তাড়াতাড়ি কিছু টাকা পাঠাতে। বোনটার অসুখ। তাই বলছিলাম—

—বুঝলাম।—বাধা দিয়ে বলেন বড়বাবু,—বিল না হলে তো পাবে না।—একটু থেমে আবার বলে,—আচ্ছা দেখি যদি হয়ে যায়।

একটু আশ্বস্ত হয় অমরেশ,—দেখবেন যাতে···খুব দরকার।

—বলছি তো!—হঠাৎ ঘড়িটা রেখে ব্যস্তভাবে বলেন বড়বাবু,—এখন যাওতো এখান থেকে। এজেন্ট সাহেবের আসবার সময় হ'ল।

খাতার ওপর ঝুঁকে পড়েন বড়বাবু।

অমরেশ বেরিয়ে আসে অফিস থেকে। খাদের দিকে হাঁটা দেয়। এজেন্ট সাহেবের চোখ এড়াতে পা চালায় জোরে। সামনে পড়ে গেলে হয়তো। স্বভাবসিদ্ধ উদ্ধত মেজাজে অপ্রিয় কিছু বলে বসবে। অধস্তন কর্মচারীদের ওপর দাপট চালিয়ে যেন আনন্দ পায় লোকটা। আর কুলি-কাবাড়িদের সঙ্গে তো 'শালে,' 'বুড়বক' ছাড়া কথাই বলে না।

খাদের মুখে দেখা হয় সর্দার দুখীরামের সঙ্গে। মালকাটাদের কাজ তদারক করতে চলেছে খাদের ভেতরে। এক হাতে ব্যাটনের মতো

একটা ছোট লাঠি আর অন্য হাতে ঝোলানো গ্যাস বাতি। চরম উচ্ছৃংখলতায় দেহটা ঘুণধরা মচকানো বাঁশের মতো সামনে ঝুঁকে পড়েছে একটু। নেশা না করলে গর্তেঢোকা খুদে খুদে চোখের দৃষ্টি যেন মর্ম ভেদ করে। কেমন অস্বস্তি ধরিয়ে দেয় মনে।

—নমস্কার বিজলীবাবু।—টিঁকে থাকা কয়েকটা অসমান দাঁত বের করে হেসে বলে দুখীরাম।

কোন জবাব না দিয়ে একটু হাসে অমরেশ।

—নিচে নামবেন, ন যাবেন কোনদিকে?

নামবো চল।—পা বাড়ায় অমরেশ।

—তবে ডাঁড়ান টুকু—বাতিটি জালি।

উবু হয়ে বসে পকেট থেকে দেশলাই বের করে গ্যাস বাতিটা জ্বালে।

হুঁ ইবার চলুন।

দু' পা এগোতেই পেছন থেকে বলে একটি মেয়ে,—দে ন হে আগুনট!

দাঁড়িয়ে পড়ে সর্দার। গ্যাস বাতির মুখটা খুলে ধরে।

এগিয়ে—আসে মেয়েটা। খোঁপায় গোঁজা বিড়িটা বের করে বাতির আগুনে ধরিয়ে নেয়। মেয়েটার আঁট-সাট ভরাদেহটার দিকে তাকিয়ে দুখীরামের মর্মভেদী দৃষ্টিটা আরও প্রখর হয়ে ওঠে।

—কি লো সুলোচনী, মনিজর দিলেক কাপড়টা? —কুৎসিৎ হাসিতে মুখটা বিকৃত হয়ে যায় সর্দারের।

—এ্যাঃ, উ দিবেক ক্যানে। —পানের রসে রাঙা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে সুলোচনা,—ঝর‍্যার বাজারলে কিনলি বলে আমি।

—প্যাঁদা বলছিস!—রসিয়ে বলে দুখীরাম,—এখন কাপড় হ'লো তুই নাই কিনবিস।

—চল চল দেরী হচ্ছে।—বিরক্ত হয়ে তাড়া দেয় অমরেশ।

বিড়িতে একটা টান দিয়ে চোখে ঝিলিক মেরে অর্থপূর্ণ মুচকি হেসে চলে যায় সুলোচনা।

ক্রুর হতাশায় খানিক ওর চলায় ভঙ্গিটা লক্ষ্য করে দুখীরাম। পরে একটা বিড়ি ধরিয়ে বলে,—থাম ন যা'তে দে কটা দিন, হাসি মিলায় যাবেক। তখন ন বুঝবিস।

সিঁড়ি-খাদের ধাপ বেয়ে নামতে থাকে দু'জনে। বাইরের সূর্যের আলো কয়েক ধাপ পরেই সুড়ঙ্গের ভেতরের সূচীভেদ্য অন্ধকারে বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। সাবধানে পা ফেলে নামতে হয়। একবার পা ফসকালে দুনিয়ার আলো আর চোখ মেলে দেখতে হবে না।

সর্দার একাই কথা ব'লে চলে। বলে সুলোচনা সম্পর্কে। ম্যানেজারের নজরে পড়ে মেয়েটা নাকি বেশ সুখেই আছে। যখন খুশী কাজে আসে, যখন ইচ্ছে চলে যায়। কিছু বলা যাবে না। তাহিলে তৎক্ষণাৎ চাকরীটি খতম হয়ে যাবে। লোভ থাকলেও এখন আর মেয়েটার ওপর কেউ নজর দিতে পারবে না। ম্যানেজার জানতে পারলে আর রক্ষা রাখবে না।···এরকম অনেককেই দেখেছে সর্দার। যতদিন ডবকা থাকে বা ম্যানেজারের নেশা না কাটে, ততদিন গরবে মাটিতে পা পড়ে না ছুঁড়ীদের। শেষে কিন্তু আসতে হয় সর্দারের কাছেই। সর্দারকে খুশী করে চাকরী বজায় রাখতে।

জানে সব অমরেশ। স্বচক্ষে দেখেছেও সব এখানকার ক্লেদাক্ত ব্যাভিচার। আবার এমনও হতে দেখেছে লালসার শিকার না হয়ে ইজ্জত বাঁচাতে কোন মেয়েকে কাজ ছেড়ে চলে যেতে, আর না হয় কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করতে।

কথায় কথায় সিঁড়ির কয়েকটা বাঁক ঘুরে শেষ ধাপে নেমে আসে দু'জনে।

তারপর নিজের কাজে লেগে যায় অমরেশ। ঘুরে ঘুরে ইলেকট্রিক মোটরগুলোকে পরীক্ষা করে দেখে। জমাট অন্ধকারে প্রচুর ধোঁয়া ওঠা ডিবরীর লালচে ক্ষীণ আলোয় গাঁইতির চোট মেরে মালকাটারা কয়লা কেটে চলে। কালো কালো যমদূতের মতো বলিষ্ঠ লোকগুলো ওকে দেখে দু' একটা কথা বলে। জবাব দিয়ে অন্য দিকে চলে যায় অমরেশ। ভয়ের কারণ না থাকলেও কেমন যেন গা

ছম ছম করে লোকগুলোকে দেখলে। নিকষ কালো মুখে সাদা ছুটো উজ্জ্বল চোখ, আর দুধসাদা দাঁত বের-করা হাসিটা বড় বীভৎস দেখায়।

—সময় কত হইল্য বিজলীবাবু ?

বিরাট উঁচু টুলের মতো বোড়িয়াতে চেপে হাঁটু গেড়ে বসে ছাদের কয়লা কাটতে কাটতে জিজ্ঞেস করে একজন।

—মনসা না কিরে ?—গলার আওয়াজে চিনতে পারে অমরেশ।

—হুঁ বাবু!

ডিবরীর অস্পষ্ট আলোয় কালো চেহারাটা ভালো করে দেখা যায় না। কেবল চোখ আর দাঁতগুলো চকচক করতে থাকে।

টর্চের আলোয় হাতঘড়িটা দেখে অমরেশ বলে,—ভোঁ পড়ার সময় হ'ল—বারোটা প্রায় বাজছে।

মনসা ফের গাঁইতিটা তুলে নেয়।

কাজ শেষ করতে আরও কিছু দেরী হয় অমরেশের। বেশ ক্লান্ত লাগে। ছাদ থেকে চুইয়ে পড়া জলের ফোঁটায় আর ঘামে জামা-প্যাণ্ট ভিজে যায়। প্যাচ প্যাচ করে গা-টা। বাতাসহীন ভ্যাপসা গরম এবং ডিবরীর কালো ধোঁয়ায় দম যেন আটকে আসে। তবু যথারীতি কাজ করতেই হয়।

এক সময়ে দম আটকানো অন্ধকার থেকে ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে টানতে টানতে রোদ-ঝরা বাইরের খোলা বাতাসে উঠে আসে। রোদের অতিরিক্ত ঝাঁঝ চোখে লাগলেও বেশ একটা আরাম বোধ করে শরীরে। বড় বড় কয়েকটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে অনেকটা করে বাতাস টেনে নিয়ে ছেড়ে দেয়।

তারপর হাটতে থাকে ঘর মুখো। আলোবাতাসহীন গুহার মতো গোলহাদ কুলি ধাওড়াগুলোকে পেছনে ফেলে হেঁটে চলে। চড়া রোদে ভিজে জামাপ্যাণ্ট শুকিয়ে যায়। গায়ের চামড়ার অমুনি ধরে রোদের তেজে। পাশের সরু লাইনের ওপর দিয়ে কয়লা বোঝাই লোহার টবগুলোকে লোডিং-এর জায়গায় ঠেলে নিয়ে চলেছে কুলিরা। দূর থেকেই দেখা যায় রেলগাড়ির ডাব্বায় কয়লা ভরছে কামিনরা। কোলের

বাচ্চাগুলোকে একটু ছায়া দেখে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। কোনটা বিরামহীন কান্নায় গড়াচ্ছে মাটিতে। ডাব্বার ছায়ায় লাঠিতে ভর দিয়ে ত্রিভঙ্গ ঢং-এ দাঁড়িয়ে লোডিংবাবু মাঝে মাঝে স্বভাবসিদ্ধ হাক ছাড়ে —জলদি, জলদি।

ঘরে পৌঁছে স্নান সেরে মেস থেকে খেয়ে আসতে ফের কাজে বেরোবার সময় হয়ে পড়ে। তবু একটু বিশ্রাম নিতে ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে দেয়। একখানা বই নিয়ে চোখ বুলোয় পাতায়। ধীরে ধীরে তন্দ্রায় জড়িয়ে আসে চোখদুটো। তন্দ্রাশিথিল হাত থেকে বইখানা খসে পড়ে কোলের ওপরে।

—ও বিজলীবাবু আমাদের ঘরে কিন্তু আলো জ্বলছে না।

—তন্দ্রা ছুটে যায়। এলানো দেহটাকে চমক খেয়ে তুলে ধরে।

জানলার ওপিঠে উচ্ছল হাসিতে ফেটে পড়ে ডাক্তারবাবুর মেয়ে মিলি। কৈশোরের শেষ কোঠায় পৌঁচেছে।

প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর; মুখখানা ভারী মিষ্টি। রোদের ঝাঁজে লাল হয়ে উঠেছে।

—ধ্যেৎ পাজি কোথাকার, মিথ্যুক!—হেসে ধমক দেয় অমরেশ,—ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

আবার এক পশলা হাসি ঝরে পড়ে।

—এখন বুঝি ঘুমোবার সময়, কাজে যেতে হবে না?

—কাজ ছেড়ে দিয়েছি।—গম্ভীর ভাবে বলে অমরেশ।

—কেন?

—আমার খুশী।

—ইস্।—ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে মিলি।

হেসে ফেলে অমরেশ। বলে,—ইস্কুল, না বাড়ী?

হেসে উত্তর দেয় মিলি,—ইস্কুল।

—তাহলে দুষ্টু মেয়ে দুটো প্রায় বাজে। দেরী করলে পিটুনী।

—আমি কখনো পিটুনী খাইনা।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ মশাই।

—একদম মিথ্যে কথা।

দু'জনেই হেসে ওঠে একসঙ্গে।

—আচ্ছা অমরেশদা,—হাসি থামিয়ে বলে মিলি,—কালকে যাননি কেন আমাদের বাড়ী।

—আজকে যাব।

ঠিকতো?

—ঠিক।

মুখে খুসীর হাসি ফুটিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায় মিলি। বুকের কাছে চেপেধরা বইখাতা। পিঠের ওপর দোল খাচ্ছে রিবন-বাঁধা দোভাঁজ দুটো বেণী। নিমেষে বাঁক ঘুরে চোখের আড়াল হয়ে যায়।

ধীরে-সুস্থে অমরেশও বেরিয়ে পড়ে। খাদে নেমে ওভারম্যানের কাছে খোঁজ নেয় কোথাও কোন ইলেকট্রিক্যাল ব্রেকডাউন অথবা কোন রিপোর্ট আছে কি না।—নেই। স্বস্তি পায় অমরেশ। সর্দারের সঙ্গে দেখা হয় না। ওপরে নাকি চা খেতে উঠেছে।

খাদ থেকে উঠে এসে হাঁপ ছাড়ে অমরেশ। সময় কাটাবার মতলবে অফিসের দিকে এগিয়ে যায়।

খানিকটা গিয়ে চোখে পড়ে সামনের নিমগাছটার ছায়ায় বসে আছে ইউনিয়নের নেতা বিন্ধেশ্বরী শর্মা। গাছের গুঁড়িতে ঠেসান রয়েছে সাইকেলটা। হ্যাণ্ডেলে বাঁধা তিনরঙা ছোটঝাণ্ডা। সর্দারও রয়েছে সেখানে। সকালের সই বোনাস-না পাওয়া লোকটাকে কী যেন বোঝাচ্ছে।

কাছে আসতে শর্মাজী বলে,—নমস্তে বিজলীবাবু।

—নমস্তে।—মৃদু হেসে বলে অমরেশ।

—খাদেরলে আনেন নকি ?—অসমান দাঁত কটা বের করে শুধোয় সর্দার।

—হ্যাঁ। সব ঠিক আছে।

—উঠলম চা খাতে ত বেচন অটকিলেক।—কৈফিয়তের সুরে বলে

সর্দার, বলছি, তুই হ'ল্যে বনাস পাবিস নাই, ন মাইনবেক নাই। বেঙ্ক বাবুঅ হাজরী খাতা দেইখে বইল্যেক। ত নাঃ, মুরুখ্যুট বইলছে ইঠিনলে দুসরা খাদে যাবেক কাজের লেগে।

—তরা হ'ল্যে সাঁট কইরে টাকা মারবিস ত যাব নাই।—ক্ষুব্ধস্বরে বলে বেচন।

—যা ক্যানে যা! মানা কইরছে কে? তর লেগে কাজ লিয়ে বইসে আছে।—রেগে যায় সর্দার,—কামাই করবিস্ ত কি তর বদনট দেইখে টাকা দিবেক মালিক?·· ···লেমখারাম নাইত।

—হাই দেখ বাখ্‌না-বাখ্‌নি করিস্ না। হ'ত নাই।···

—না কইরবেক নাই।—মুখ বিকৃত করে বলে সর্দার,—ইয়ার মইধ্যে ভুলিস শালা—সিবার কয়লা কাইটতে চট পলিস ত মালিকেই ন তকে ধানবাদে হাঁসপানালে পাঠায় ছিল? ইস্‌পিরিনের খাটে মটা বিস্তারায় শু'য়েছিস কভু? বইল্যেই মেথরে বেডফানটি আড়্যে দিথক —মনে নাই? এখন মেজাপ দেখাছে। যা, কাজ কর যাঁয়ে। বকা নাই ত।

আর না দাঁড়িয়ে চলতে থাকে অমরেশ। ও' ভালো করেই জানে কিছুতেই বোনাস পাবে না বেচন। এবং কাজও ওকে করতে হবে এখানেই। যদি-বা চলে যা, পুলিশের কাছে রিপোর্ট করবে কোম্পানী —ধারের টাকা শোধ না করে পালিয়েছে বেচন মালকাটা।—নিরক্ষর লোকগুলোকে ঠকানোর একটা সুপরিকল্পিত নিষ্ঠুর অন্যায়কে নীরবে মেনে নিতে হয় অমরেশকে। মেনে নেয় নিজের জীবন এবং জীবিকার সংশয় যেন না ঘটে।

অফিসের কাছাকাছি পৌছতেই একটা গোলমাল কানে আসে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অমরেশ। দূর থেকে দেখতে পায় কয়েকজন মালকাটা কাকে যেন চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলেছে ডাক্তারখানার দিকে। অমরেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় সেদিকে।

কাছে গিয়ে দেখে এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মনসার। ছাদের কয়লা কাটতে ঘোড়িয়া উল্টে নাকি পড়ে গেছে। চোট লেগেছে মাথায়।

কানের পাশে ফেটে গেছে খানিকটা রক্ত পড়ছে চুঁইয়ে। নিথর চোখ দুটো মেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। অস্বাভাবিক লাল দুটো চোখ। কয়লামাখা কালো মুখের কোটরে চোখের বদলে যেন দু'ফোঁটা জমাট রক্ত। হঠাৎ মুখটা বিকৃত করে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে কাটা ছাগলের মতো এবং সেই সঙ্গে বেরিয়ে আসে একটা গলাকাটা জান্তব চীৎকার! পরমুহূর্তে শান্ত হয়ে নিশ্চলভাবে পড়ে থাকে।

পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবুর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি একটা ইঞ্জেকসন দিয়ে এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেন। শিগ্‌গীর ধানবাদ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

সর্দার আসে খবর পেয়ে। সঙ্গে শর্মাজী।

—সহে, ডাগর চট লহে।—কাটা জায়গাটা দেখে বলে সর্দার। শর্মাজীও সায় দেয়,—হাঁ, থোরাসে চোট লাগা। ঘাবড়ানেকা কুছু নহি। থমথমে মুখে ভ্রূকুটি করে ডাক্তারবাবু। ধমকে ওঠেন সবাইকে চলে যাবার জন্য।

ধমক খেয়ে মনসাকে বয়ে-আনা লোকগুলো সরে যায় খানিকটা।

—হঁত ভালই বইলছেন। ইঠিন ভিড় লাগাছিস ক্যানে?—ব্যস্তভাবে লোকগুলোকে তাড়া দেয় সর্দার,—যা আপন আপন কাজ কর যাঁয়ে।

—থাম যাবই বা। টুকু দেইখতে দে।

—দেখবিস কি, ত কি ই-ট লৌতন ঘইটছে যে দেখবিস।

তবু যেতে চায় না কেউ। উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এক সময়ে এ্যাম্বুলেন্স এসে নিয়ে যায় মনসাকে। সঙ্গে যান ডাক্তারবাবু।

তারপর লোকগুলোও ফিরে যায় নিজের কাজে। নিজেদের নিরাপত্তাহীন জীবনের কথা ক্ষুব্ধস্বরে বলতে বলতে যায়।

মনটা খারাপ হয়ে যায় অমরেশের। আরও খানিকটা সময় অফিসে কাটিয়ে ফিরে আসে ঘরে।

এবং সূর্যডোবা শেষ বেলায় বিষণ্ণ মনে যায় ডাক্তারবাবুর বাড়ী।

স্বল্পপরিসর উঠোনে একটা চৌকি পাতা। তাতে পা ছড়িয়ে বসে কোলের ওপর একথালা তেলমাখা মুড়ি কাঁচালঙ্কা আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে খাচ্ছে মিলি। অমরেশকে দেখে কোন আগ্রহই প্রকাশ করে না। নির্লিপ্ততার ভান করে চেঁচিয়ে ওঠে,—মা তোমার ছেলে এসেছে —আদর-যত্ন কর।

মনটা ভার থাকা সত্ত্বেও হাসি পেয়ে যায় অমরেশের। শাসিয়ে বলে,—পিঠে এক্ষুনি কিল পড়বে কিন্তু।

—ইস্, পড়লেই হলো।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসেন মনোরমা। হেসে বলেন,—কিরে ছেলে, কালকে আসিসনি কেন?

—ধানবাদে গেছিলাম কাকিমা।

—ও, বুঝেছি।—মুড়ি চিবুতে চিবুতে বলে মিলি,—সিনেমা দেখতে যাওয়া হয়েছিল।

—হয়েছিলই তো।—মিলির থালা থেকে এক মুঠো মুড়ি তুলে নেয় অমরেশ।

—বারে আমার গুলো খেয়ে নিচ্ছে!—থালাটা সরিয়ে নেয় মিলি।

হিংসুটে।

এক কুচি পেঁয়াজ মুখের ভেতরে ছুঁড়ে দিয়ে বলে মিলি,—বেশ, তাই।

—খাবি? দিই মেখে চাট্টিখানি।—সস্নেহে বলেন মনোরমা।

—না কাকিমা, থাক।

—পেটে খিদে মুখে লাজ।—দুষ্টুমি ভরা চোখে তাকায় মিলি,—অথচ লোকেরটা খেতে ওস্তাদ।

—শাস্ত্রে বলে হিংসুটেদের খেলে দোষ নেই।

—দেখ মা তখন থেকে খালি হিংসুটে বলছে।

মনোরমা হাসতে হাসতে উঠে যান রান্না ঘরে।

—কেমন! নালিশ করে হ'ল কিছু?

মিলি কিছু না বলে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। একটা বাটিতে অল্প করে মুড়ি মেখে এনে অমরেশকে দেন মনোরমা।

—লোভী, এক নম্বরের লোভী!—রাগের ভান করে অমরেশের দিকে তাকিয়ে বলে মিলি।

অমরেশের সঙ্গে মনোরমাও হেসে ওঠেন। শেষে মিলিও যোগ দেয় হাসিতে।

হাসি-ঠাট্টায় মনের ভারটা কেটে যায় অমরেশের। এ-বাড়ীতে এলে ও'যেন ছেলেমানুষ হয়ে পড়ে। বিদেশে আত্মীয় স্বজনের অভাববোধটাও থাকে না।

মনোরমা ফের রান্নাঘরে চলে যান।

খাওয়া থামিয়ে হঠাৎ মিলি জিজ্ঞেস করে,—আচ্ছা অমরেশদা, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন ?

—অন্ধকারে একা থাকলে করি বৈকি।—পরিহাস করে বলে অমরেশ।

—না, সত্যি বলুন না। এই যে খাদে এ্যাক্সিডেন্ট হয়, এসব নাকি ভূতে করে ?

এরকম একটা জনশ্রুতি আছে বটে। কিন্তু অমরেশ বিশ্বাস করে না। মালিকের ত্রুটি ঢাকতে অনেক আজগুবি প্রচার চলে। প্রচার করে সর্দার বা মালিকের পেটোয়া লোকে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর সংস্কারের সুযোগ নিয়ে মানুষের জীবনকে কত মূল্যহীন মনে করে মালিকরা।—মিলিকে এসব বোঝাবার চেষ্টা করে অমরেশ।

—হ্যাঁরে অমু, ছেলেটা বাঁচবেতো ?—কাছে এসে বলেন মনোরমা।

—কে, মনসা ?

—ঐ যে আজ এ্যাক্সিডেন্ট হলো ?

—কি জানি কাকিমা, বলা যায় না।

—আচ্ছা অমরেশদা···

কথাটা শেষ করার অবকাশ পায় না মিলি। ডাক্তারবাবু এসে পড়েন। কেমন যেন বিমর্ষ ভাব।

—মনসা মারা গেল, অমরেশ।

হঠাৎ যেন একটা আকস্মিক আঘাত পেয়ে চমকে ওঠে সকলে। সন্ধ্যার নেমে আসা অন্ধকারের মতো একটা বিষাদের ছায়া মেশানো নিবিড় নিস্তব্ধতা নেমে আসে মুহূর্তে।

—আহা রে!—কতক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন মনোরমা। দীর্ঘনিঃশ্বাসটা বড় স্পষ্ট করে শোনা যায়।

মিলিও কেমন চুপ মেরে গেছে। ভাসা ভাসা ডাগর কালো চোখ-দুটি মেলে চেয়ে থাকে একদিকে।

—মাথার ভেতরে হেমারেজ হচ্ছিল: এসব কেস-এ সাধারণতঃ বাঁচানো যায় না। দেরীও হয়ে গেল।—পোষাক ছাড়তে ছাড়তে বিমূঢ়-বিস্মিত অমরেশকে লক্ষ্য করে বলেন ডাক্তারবাবু।

হঠাৎ বুকটা টন টন করে ওঠে অমরেশের। কোন কথা বলতেও ভাল লাগে না। মনটা দারুণ ভারী হয়ে যায় মনসার জন্য। ভালো লাগতো ছেলেটাকে। বেশ হাসিখুসী—সরল। মাঝে মাঝে ঝুমুর গেয়ে শোনাতো, আর গল্প করতো রসনার। গাঁয়ের ওই মেয়েটাকে বিয়ে করার কথা ছিল পূজা বাদ। টাকাও জমাচ্ছিল বিয়ে করার।

খানিক বাদে উঠে পড়ে অমরেশ। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে চলে আসে—যেখানে মনসার দেহটাকে ঘিরে আলোচনা হচ্ছে কুলি-কামিনদের। স-ক্ষোভ দুঃখ প্রকাশ পায় ওদের কথাবার্তায়।

নিঃশব্দে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে অমরেশ।

—মনসা···!

বুকফাটা চীৎকার করে পাগলের মতন ছুটে আসে মনসার বুড়ীমা। উথাল পাথাল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে—মনসার স্পন্দনহীন দেহটার বুকে আছড়ে পড়ে।

দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো হঠাৎ নির্বাক হয়ে যায়। একটা পাথর-জমাট নিস্তব্ধতা নেমে আসে। শুধু বুড়ির বুকভাঙ্গা কান্না সেই নিস্তব্ধতাকে আরও জমাট, আরও নিবিড় করে তোলে।

—বাবু!—অমরেশের মুখের দিকে দৃষ্টি তুলে কান্নাভাঙ্গা গলায়

বুড়ী বলে ওঠে,—উয়ারা আমার ব্যাটাকে খুন কইরলেক।

তীব্র মোচড়ে বুকের ভেতরে যেন কিছু ছিঁড়ে গলার কাছে এসে আটকে যায় অমরেশের। ব্যথা ধরিয়ে দেয় গলাটাকে। ভিজে ওঠে চোখের পাতাগুলো।

লোকগুলোর মুখের দিকে চেয়ে দেখে অমরেশ :—না কারো চোখে জল নেই। বরং সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে নজরে পড়ে, ওদের বুকের ভেতরে যে আগুন ধিক ধিক জ্বলছে, তাই যেন শেষবারের মতো জ্বলে ওঠার আগে চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে।

স্নায়বিক

মানিক বল

পুরোনো সিঙ্গার মেসিনটা আবার ঘর্ঘর করে নড়ে উঠলো। দরজার পর্দাটায় সেলাইয়ের শেষ টান দিচ্ছিল সরমা। হঠাৎ সুতো ছিঁড়লো—নীচের সুতোটা ঘুরপাক খেয়ে জট পাকিয়ে গেল। চরম বিরক্তি। দাঁত দিয়ে সেলাইয়ের বাড়তি সুতোটা কাটবার চেষ্টা করতে লাগলো সরমা।

দুর্গাপ্রসন্ন কোটের দুটো হাতে বোতাম ক'টা ঠিক আছে কিনা দেখলেন—হাত দুটো পুরে দিলেন। 'রুমালটা চামড়ার স্যুটকেশে'—সরমা মেসিনে বসেই বলে। দুর্গাপ্রসন্ন ততক্ষণ গলার বোতাম আঁটতে মন দিয়েছেন। আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাই অদ্ভুত ঠেকলো যেন তাঁর। কোর্ট প্যান্ট ছেড়েছেন আজ দশ বছর। আবার এগুলো পরে কাজে নামতে হবে ভাবেননি কখনো।

বাগানের গেটে স্প্রীংটা যখন বিশ্রী শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎই যেন সরমার ঘোর ভাঙলো। জানলায় উঠে এল। দুর্গাপ্রসন্ন···বাঁহাতে মোড়া ষ্টেটস্ম্যান্ আর পুরোনো ব্রিফকেস্। দু'পায়ে অপার দৃঢ়তা। অসম্ভব সোজা হয়ে হাঁটছেন দুর্গাপ্রসন্ন···কড়া ইস্ত্রী কালো কলারে যেন অসম্ভব জিদ। দু'কাঁধে ছিলে-পরানো ধনুকের সংকল্প। দুর্গাপ্রসন্ন মোড় ঘুরছেন···আর দেখা যাচ্ছে না। সরমা অনেক কিছু ভাবলো, আরও ভাবতে পারতো কিন্তু আর ভাবলো না···মেসিনটা নড়ে উঠলো ঘর্ঘর করে।

আদালতের দরজায় এসে পড়েছেন দুর্গাপ্রসন্ন। প্রচণ্ড রোদের ঝাঁজ। মেঘ ভাঙা রোদ। বুড়ো বট গাছটায় নতুন ঝুরি নামছে! নেমেছেও অনেকগুলো। কাটা ফল, ঝাল-শশার মরসুম সুরু হয়ে গেছে। গরম সবে সুরু। দুর্গাপ্রসন্ন সোজা গেলেন ওঁদের বসবার

ঘরে। টানা পাখাটার জংধরা কপি কলে বিশ্রী আওয়াজ। হয়তো সতেরো বছর আগে লাল শালুর ঝালরটা লাগানো হয়েছিল। যা দশা! 'অবিনাশ, একগ্লাস জল দাও'—একটা চেয়ার টেনে নিলেন দুর্গাপ্রসন্ন। অবিনাশ পাখার টানে টানে ঝিমোচ্ছিল অকাতরে। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো—'আসুন বাবু'—অস্বাভাবিক গলায় বলে ওঠে অবিনাশ।

গ্লাসের কাচে নির্দিষ্ট চোখ দুর্গাপ্রসন্ন। টেবিলের অন্যপ্রান্তে শ্যামল—সদ্য এখানে ওকালতি ধরেছে। আরও ধরেছে—রাজনীতি। দুর্গাপ্রসন্ন গ্লাস রেখে উঠে দাঁড়ান। তারপর বারান্দা—মাঠ—চায়ের চালা ঘরটা ছাড়িয়ে যায় লাইব্রেরীতে। 'শ্যামল নিশ্চয়ই আড়চোখে তাকিয়েছিল এবং উঠে আসার সময় ও যে জুতো ঘষছিল তারও নিশ্চয় একটা অর্থ আছে। —চিন্তাটা পিঠে বেঁধা কাঁটার মত দুর্গাপ্রসন্নর অসহ্য ঠেকছে। ফলে লাইব্রেরীর বেয়ারা যখন স্বগতোক্তি করল—"বাবু কত বছর পর এলেন', দুর্গাপ্রসন্নর কপালে ভাঁজ পড়ল। উত্তরটা ভারী হয়ে বেরুল—'হ্যাঁ, এলাম'। অবশ্য শেষ পর্যন্ত দুর্গাপ্রসন্ন যা আশঙ্কা করেছিলেন তা ঘটলো না। অনেক সহকর্মীরাই তাঁকে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিল, গল্প করল অনেকক্ষণ। বার এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীশবাবু তো জড়িয়েই ধরলেন তাঁকে। শ্রীশবাবু তেমনিই আছেন, তবে কিনা তাঁর দীর্ঘ দেহ একটু বেশী নুয়ে পড়েছে, মাখন রঙের চামড়ায় বেশ একটু ভাঁজ ধরেছে। নতুন এসেছেন জেলা জজ। একটু আনুষ্ঠানিক আলাপ মাত্র হয়েছে দুর্গাপ্রসন্নর। যাইহোক সব মিলিয়ে খুব একটা ওলট পালট যে হয়নি পৃথিবীর এইটুকু অনুভব করেই তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। এই পৃথিবী আইন—আদালত—জেল—জরিমানা—জামিন—খালাস—হুজুর—হাজির নিয়ে তেমনি ব্যস্ত। সব তেমনিই আছে।

বিকেলের রোদ্দুরে একরাশ কাচ-রঙা বটপাতা ঝলকে উঠলো দুর্গাপ্রসন্নর ঠিক সামনের ডালটায়। একটু অন্যমনস্ক হয়েই গিয়েছিলেন তিনি চোখ দু'টো নামিয়ে আনলেন যখন তখন তিনি আদালতের চৌহদ্দি পেরিয়ে রাস্তার মোহানায়। …অনেক লোক। রিক্সার জটলা,

বাসের হাঁক ডাক···বিশ্রী গন্ধ শব্দ···। 'একদল লোক আড়চোখে দেখছে না? রাস্তার ঠিক ও-পাশে?' মনে হতেই দুর্গাপ্রসন্নর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না সে সবকিছু ঠিক 'তেমনিই নেই'। মুহূর্তে সিঁথির সামনের চুলগুলো সজারুর কাঁটার মত উঁচু হয়ে উঠলো। একটা বিদ্যুৎ যেন তাঁকে এইমাত্র ছুঁয়ে মাটিতে মিলিয়ে গেল।

নির্বাচনে হেরেছেন দুর্গাপ্রসন্ন। হাজার বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর সহকর্মীরা দু'হাজার খ্রীষ্টান ভোট ধরেই নেয়া (বিশপ নিজে গিয়ে পাড়ায় প্রত্যেককে যীশুর নামে বলে এসেছেন), নতুন বাস্তুহারা পল্লী দু'শো পরিবার করায়ত্ত (সামান্যই যারা লাল নিশান ওড়ায় আর চিৎকার করে)—সেদিনও তো পঞ্চাশ ঘরকে শিল্প ঋণ পাইয়ে দিলেন দুর্গাপ্রসন্ন। চারটে গাঁয়ের প্রাইমারী স্কুলের হেডমাষ্টার প্রত্যেকে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন; ইউনিয়ন বোর্ডের সভা সভাপতিরা কথা দিয়েছিলেন (আর ব্যক্তিগতভাবে হাজার সুযোগ তাঁদের করে দিয়েছেন দুর্গাপ্রসন্ন); ঐ গাঁয়ের মুসলমান ভোটগুলো নিশ্চিত—সোরপুর গ্রামটা হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ··কিন্তু তাতেই বা কী করে ·· শেষ পর্যন্ত সব হিসেবের গরু বাঘের পেটেই যায়···রাত হয়, হিসেব মেলেনা। দু'চক্র চায়ের পর পেয়ালা পিরিচে পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি আর সিগারেটের ছাই গড়ায়—হাই ওঠে। সবাই উঠে পড়ে। দুর্গাপ্রসন্ন ইজি চেয়ারে গা ছেড়ে দেন, কানের কাছে রগ দু'টো দপ্‌দপ্ করে জ্বলে।

সমূহ-বিপত্তি মহীতোষের। মহীতোষ দুর্গাপ্রসন্নর ডান হাত, বলতে গেলে সবকিছুতেই। ক্ষমতাও আছে—গ্রাম থেকে গ্রাম ঘুরেছে, বক্তৃতা দিয়েছে, বুঝিয়েছে, ভোট সংগ্রহ করেছে। অন্নজল তার শিকেয় তোলা থাকতো প্রায় রোজই। মন্দলোক বলতো দুর্গাপ্রসন্নর তহবিলেই মহীতোষের মূল শেকড়টাই ছিঁড়ে গেল। অবশ্য সে রোজ সন্ধ্যেতে আসে, এখনো আসে, বসে, পান চিবোয়—রাত হলে বৈঠকখানা থেকেই চলে যায়। (দুর্গাপ্রসন্ন কদাচিৎ বৈঠকখানার চৌকাঠ মাড়ান।)

আজকাল অনেক রাত পর্যন্ত আইনের পাতা ওলটান দুর্গাপ্রসন্ন।

নতুন দু' একটা মামলাও ধরেছেন সম্প্রতি। রোজ কোর্টে যান গম্ভীর মুখে, ফেরেন আরো গম্ভীর হয়ে। পুরোনো মক্কেল কেউ কেউ মাঝে মাঝে আসেন—দুর্গাপ্রসন্ন আইনের পরামর্শ দেন। কখনো মামলা নিজে হাতে তুলে নেন। দশ বছর আগের পসায় ফিরে পেতে অনেক কাঠ-খড়ই যে পোড়াতে হবে এটুকু দুর্গাপ্রসন্ন বুঝেছেন। তবু চেষ্টা···ছুটির দিন বাড়ীতেই থাকেন। খবরের কাগজ পড়েন। খান-দান, ঘুমোন। ভাল লাগলে সন্ধ্যেয় বেড়ান। কিন্তু এটাও যে ঠিক পছন্দ নয় সরমা বোঝে···অগত্যা স্বামীকে বোঝায়, বোঝাতে চেষ্টা করে অন্তত। স্বামীকে সঙ্গ দেয়, সঙ্গে রাত জাগে···অনেক রাত···ভাবে ··অনেক কিছু হয়তো···তারপর কানের পাশের রগ দুটো দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলতে থাকে···!

সন্ধ্যেবেলা বৈঠকখানায় ভিড় কমেছে। তেঁতুল গাঁয়ের য়ুনিয়ন বোর্ডের মুরুব্বি হুসেন মিঞা, ডাক্তার গোঁসাই, কিংবা কন্‌ট্রাক্টর ঘোষ আসেছন না আর সম্প্রতি। মহিতোষ আসে, কিন্তু একদিন অন্তর। অন্যান্য চ্যালা-চামুণ্ডাদের উপদ্রবও নেই। তবু স্বস্তি। মহিতোষ হঠাৎ এরই মধ্যে একদিন হরিনাথ সাধুখাঁকে নিয়ে বৈঠক-খানায় হাজির। দুর্গাপ্রসন্ন কী কারণে যেন ওখানেই বসেছিলেন।

'হরিনাথবাবু একটা কথা বলতে এসেছেন'—মহিতোষ অনুনয় করে বলে। (দুর্গাপ্রসন্ন সুইং চেয়ারে একবার নড়ে বসেন) সাধুখাঁই শেষে কথা সুরু করে—'কুতুবপুরের রাস্তায় নতুন বাসের পারমিট্‌ দিচ্ছে··· শুনেছি আটখানা দেবে। (সুইং চেয়ার একটু দোলে।) সাধুখাঁ বলে চলে "আমার ধানের কলটা ওখানে···দু'খানা বাস পেলে···একই রাস্তায়···দেখা শোনার সুবিধে।···আর ধানের ব্যবসা তো তিন মাসের বলতে গেলে ··" (সুইং চেয়ার দোল খায়।) "তা আমি কী করতে পারি ?" —দুর্গাপ্রসন্ন চেয়ারের পেছনে মাথা হেলিয়ে দেন। "আপনি সব পারেন—তাছাড়া কার কাছেই বা যাব ?" (সুইং চেয়ার বাঁদিকে শব্দ করে একটু ঘোরে)। মহিতোষ বুঝতে পারে···ইঙ্গিতে সাধুখাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করে এবং তারপর মুহূর্তে নমস্কার সেরে দু'জনে

চৌকাঠ পেরিয়ে রাস্তায় এসে নিঃশ্বাস ফেলে—বলেতে গেলে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

পরের দিন যখন মহিতোষ এলো মুখে তার অন্য কথা। গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তাবনা। এবার জোয়ার নাকি উল্টো দিকে।

...দুর্গাপ্রসন্ন হাল ছেড়েছেন...নৌকোর গলুই যে ঘুরে গেছে... অনেক করে এই কথাটাই বোঝাতে চাইল মহিতোষ। নিরুদ্বিগ্ন দুর্গাপ্রসন্ন জিজ্ঞেস করলেন...তোমার মা বাবা ভাল আছেন?' মহিতোষ হতবাক হয়ে গেল...হঠাৎ উৎসাহে টোল খেয়ে গেলে কথা আর জমে না—জমতে পারে না। মহিতোষ তাই অন্য অছিলায় উঠে পড়ে।

দোলের দিন। হোলির দল বেরিয়েছে...ধাঙড়-বস্তীর দলটা সন্ধ্যের সময়টাতেই ঠিক হুড়মুড় করে দুর্গাপ্রসন্নর গেটের সামনে এসে দাঁড়াল...তারপর সুরু বিদ্‌ঘুটে নাচ, তাল, গান আর বাজনা। সব কটার মাথায় লাল কাপড়ের ফালি বাঁধা—হাতে ছোট লাঠি...হৈ, হৈ, রৈ রৈ...'মন্ত্রীবাবুর বাড়ী বলেই সর্দার মশালটা তুলে ধরে গর্জে উঠলো...'জোরসে' সঙ্গে সঙ্গে ছ-সাত জোড়া করতাল আর ঝাঁঝ্ বেজে উঠলো...এর মধ্যে আরো চারটে মশাল ধরানো হয়েছে...মশাল-গুলো নাচছে। দুর্গাপ্রসন্ন বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন...সঙ্গে সঙ্গে... 'জয়'। দুর্গাপ্রসন্নর অতীত গৌরবের ধুয়ো মাত্র, তবু এই জয়ধ্বনি খারাপ লাগলো না তাঁর।...দশ টাকা নগদ বখশিস পেয়ে পাঁচ-ছটা মশাল নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল রাস্তায়...সঙ্গে সঙ্গে লাল-ফালি বাঁধা কতগুলো মাথা...মশালের তামাটে আলোয় দুর্গাপ্রসন্নর রক্ত চলকে উঠলো...সামনের চুলের গোছাটা সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠলো। দিন দশেক ধরে ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েছেন, দুর্গাপ্রসন্ন। একদিন অন্তর একদিন কলকাতা...অন্যদিন সূর্য ওঠার আগেই গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। রাত হয় অনেক...প্রায় প্রতিদিনই...রাত হয় অনেক। দুর্গাপ্রসন্ন টেবিলে কাজ করেন...কাজ ক'রে চলেন। কোর্টে যাওয়াও বন্ধ। জিজ্ঞেস করে না সরমা...ভয়ে। আঁচ করতে চেষ্টা

করে···পারে না। রাত ভ'র কতগুলো কাগজ পত্তর নিয়ে কী যেন করেন দুর্গাপ্রসন্ন ··সরমা ভয়ে মরে···কিছু জিজ্ঞেস করবার সাহস পায় না।···আঁচ করতেই চেষ্টা করে···পারে না। সম্প্রতি একটা মারামারি হয়ে গেছে কুতুবপুরে ··দু'টো লোক হাসপাতালে এসেছে···পুলিশ এসেছিল দুর্গাপ্রসন্নর কাছে··অনেক রাতে। তবে কি···। কিন্তু দারোগা তো হাসিমুখেই চলে গেছে ··তবে। সরমা বুঝতে চেষ্টা করে··· পারে না। সাধুখাঁ সেদিন হঠাৎ এলো···তবে কি···দুর্গাপ্রসন্ন অনেক-গুলো কাগজ পোড়াচ্ছিলেন সেদিন রাত্রে ··তবে কি···পরশু জেলা-বোর্ডের সভায় দুর্গাপ্রসন্নর কুৎসিৎ নিন্দা হয়েছিল কাগজে বেরিয়েছে··· আজ হেদায়েৎ মিঞা এসেছিলো · হেদায়েৎ পাকিস্তান থেকে জিনিস পাচার করে···হঠাৎ জুটলো এসে কেন ? (সরমা সন্দেহ করে হয়তো ···কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না।) হঠাৎ সব কুয়াশা মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল যখন মহিতোষ এসে সরমাকে জানাল—দুর্গাপ্রসন্ন হাঁসপাতালে··· পঞ্চায়েতী ভোটের জন্য বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ··কোত্থেকে একটা ইঁট . খুব গণ্ডগোল ··মাথায় চোট্ লেগেছে ··এদিকে এন্‌ফোর্সমেন্ট খবর পেয়েছে ···যে কোন সময় বাড়ী সার্চ হতে পারে ··সাবধানে থাকবেন ·· হাঁসপাতালে দেখে এসেছি ওঁর জ্ঞান হয়েছে···চিন্তা করবেন না···গিয়েই আমি আবার খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি···হ্যাঁ ওঁর হলদে চামড়ার সুটকেশের কাগজ পত্রগুলো···বরং সবশুদ্ধ সুটকেশটাই দিন আমাকে···এখানে ওসব রাখা ঠিক হবে না···যে কোনো মুহূর্তে সার্চ হতে পারে···"

সরমা ঘরে এসে সুটকেশ খুলল···কোনো কাগজ পত্র নেই তার মধ্যে···আঁচ করতে চেষ্টা করে সরমা—আঁচ করতে পারে—রাত দুপুরে সেদিন দুর্গাপ্রসন্ন জ্বলন্ত আগুনে এই কাগজ-পত্রগুলোরই সৎকার করছিলেন।

বুদ্ধুর বুদ্ধি

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গৃহিণী পিত্রালয়ে যাবার সময় শ্রীমান বুদ্ধুর হাতে আমাকে সমর্পন করে বলে গেছেন, দেখিস, বাবুর যেন কোন অসুবিধা না হয়। আমি ফিরে না-আসা পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাস্‌নে যেন। তারপর গলাটা নীচু করে আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে একান্ত গোপনীয় যে বিশেষ নির্দেশগুলো তাকে দিলেন তার ছেঁড়া ছেঁড়া কয়েকটা টুকরোমাত্র আমার কানে এলো এবং তা থেকে অনুমান করতে একটুও কষ্ট হোল না যে এই top secret policy matter এর কেন্দ্রবিন্দু আমিই। অফিস ফেরৎ কত রাত্তিরে বাড়ি ফিরি, কী কী খাই, কাকে কাকে খাওয়াই, শরীর খারাপ হলে চেপে যাই কিনা, বাড়িতে কে কে আসা-যাওয়া করে. চায়ের মাত্রা হঠাৎ বাড়িয়ে ফেলি কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো তথ্যসম্বলিত গোপন রিপোর্টটি যেন তাঁর দপ্তরে পেশ করা হয়।

বুদ্ধু বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে তাঁকে অভয় দিয়ে যা নিবেদন করলো তার মর্মার্থ, তার ঘটে যথেষ্ট বুদ্ধি আছে।. পাঁচজনের আশীর্বাদে প্রশাসনিক দক্ষতাও বিশেষভাবে অর্জন করেছে। সে সবই বোঝে, সবই দেখে, শুধু চোখ কান বুজে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকার ভান করে মাত্র। সুতরাং ওসব ব্যাপারে উপদেশদাত্রীর আশঙ্কার বা দুশ্চিন্তার কোন সঙ্গত কারণ নেই। তিনি নির্বিঘ্নে শুধু পিত্রালয়ে কেন, যমালয়েও স্বচ্ছন্দে গমন করতে পারেন।

শ্রীমতী বুদ্ধুর মাভৈঃ, প্রতিশ্রুতি ও মনিব সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সচেতনতায় খুসি হোয়ে তার হাতে কিছু কাঞ্চন উপহার গুঁজে শেষ-বারের মতো তার সঙ্গে আর একবার ইঙ্গিত বিনিময় করে পথে পা বাড়ালেন। উপঢৌকিত বুদ্ধু তুষ্ট হোয়ে একগাল হেসে তাঁকে পুনরায়

পুরোনো অভাবনীয় পুনরাবৃত্তিতে আশ্বস্ত করলো।

বুদ্ধু একটি বিচিত্র জীব। সোজা কথায়, সহজ ভাবে কিছু বলা যেন ওর কোষ্ঠিতে লেখা নেই। কোন কিছুর প্রয়োজন হোলে ভাব-ভঙ্গি, আভাস-ইঙ্গিতে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গেঞ্জি ছিঁড়ে গেলে সরাসরি ভাবে কখনো বলবে না, বাবু, আমার গেঞ্জি ছিঁড়ে গেছে, একটা কিনে দিন। সেই ছেঁড়া গেঞ্জিটি গায়ে দিয়ে কারণে অকারণে বার বার চোখের সামনে ঘুর ঘুর করে। তাতেও দৃষ্টি আকৃষ্ট না হোলে আর এক ধাপ এগিয়ে যায়, প্রয়োগ করে তার নিজস্ব উদ্ভাবিত মোক্ষম অস্ত্র। কাউকেই সম্বোধন না করেই ছেঁড়া জায়গায় আঙ্গুল দিয়ে জিভ আর টাকরার সাহায্যে একটা চরম আক্ষেপ সূচক 'চক্‌চক্‌' শব্দ করে স্বগতোক্তি করে ইস্। এবারের গেঞ্জিটা বড্ড তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে গেলো। —এমন ভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে যেন কোন অশরীরী তৃতীয় পক্ষকে অভিযোগটা শোনাচ্ছে, আমি সেখানে গৌণ। হঠাৎ ওর সেবাযত্নের মাত্রাধিক্য ঘটলেই বুঝতে হবে কোন একটা বড় রকমের আবেদন পেশ করবার জন্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। যথাস্থানে যথাসময়ে সেটি নিবেদিত হবে।

সেদিন অফিস থেকে ফেরা মাত্র বুদ্ধু পড়ি-কি-মরি করে ছুটে এসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে অভিভাবকদের সুরে বললো, শুয়ে দুদণ্ড জিরিয়ে নিন, আমি চা নিয়ে আসছি এক্ষুনি।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই বুদ্ধু, বুদ্ধদেবের একটি অতি পরিচিত দণ্ডায়মান ভঙ্গির অবিকল অনুকরণে চা-জলখাবার হাতে দর্শন দিলো। বরাত জোর, বুদ্ধু মারফৎ বুদ্ধদর্শন ঘটলো। হার্বিগুলো যথাস্থানে রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে আমার পদসেবায় আত্মনিয়োগ করলো। খানিকটা আতঙ্কিত হলাম। বুদ্ধুর কী শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিভ্রংশ হোল। সাশ্চর্যে প্রশ্ন করলাম, হঠাৎ যে তোর এতো দয়া?

বুদ্ধু ছোপধরা দন্তরুচি বিকশিত করে সলজ্জ গলায় উত্তর দিলো, সারাদিন আপনার যা খাটাখাটনি যায় তাতে একটু আধটু যত্ন আত্তি না পড়লে শরীর বইবে কিসের জোরে?

বুদ্ধু দেখছি আমাকেই একটি আস্ত বুদ্ধু বানিয়ে ছাড়লো। তার অতি বড় মিত্রও তাকে স্বার্থপর, পরদুঃখ কাতর বা পরসুখ চিন্তাবিদ্ অপবাদ দিতে পারবে না। কিন্তু আজ আমার নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। অবিচারের লজ্জায় নিজের ওপরই ধিক্কার জন্মে যাচ্ছে। এতোকাল এতো কাছে থেকেও তাকে ঠিকমতো চিনতে না পেরে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম।

জুজুৎসুর প্যাঁচের মতো বেশ কায়দামাফিক দলাই-মলাই চলছে। স্বর্গীয় আরাম। ফিকে নীল আমেজে চোখ বুজে নিঃশব্দে পড়ে রইলাম। প্রতিবাদ করলাম না তার উক্তির।

মিনিট কয়েক কেটে গেলো।

বুদ্ধু উসখুস্ করে। বললাম, কীরে কষ্ট হচ্ছে? থাক্ আর দিতে হবে না, ছেড়ে দে।

: কী যে বলেন বাবু! —বিস্মিত উক্তি করলো সে। তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল দীপ্তিতে ঝলমল করে উঠলো, আমি চাষার ছেলে বাবু, এ তো কিছুই নয় আমার কাছে। দু'মণ আড়াই মণ মোট মাথায় পাঁচ-ছক্রোশ পথ হেঁটেছি বিষ্টি-বাদলার রাতে। খরার দিনে কাঠফাটা রোদ্দুরে একা দুবিঘে জমি কুপিয়েছি একদিনে। দুঘণ্টায় একটা গোটা কুয়োর জল ছেঁচে মাটি বার করে দিয়েছি। এটুকু মেহেনত তো জলপানি। গায়েই লাগে না। ধরা শরীরের আড়ই ভাঙ্গে না এতে।

আজ শুধু আমার অবাক হবার পালা। তার অদম্য কর্মশক্তির অলৌকিক কাহিনী আমায় রীতিমতো বিচলিত করে তুলেছে। হারকিউলিস্ বেঁচে থাকলে হার্টফেল করতেন হয়তো। বুদ্ধুর কর্ম-দক্ষতা ও শক্তি সম্বন্ধে গৃহিণীর অভিমত অনুকূলে তো নয়ই বরং প্রতিকূল। তিনি ওকে 'অকম্মের ঢেঁকি', 'অকেজো গোঁসাই', 'কুড়ের বাদ্শা' প্রভৃতি বিশেষণে সম্বোধন করে থাকেন। আমার ধারণার অনুরূপ। শ্রীমতীর বিশেষণ নির্বাচন ও প্রয়োগ নৈপুণ্য সত্যিই প্রশংসনীয়। এ হেন বুদ্ধুই আজ সুযোগ বুঝে অবলীলাক্রমে আমার

কাছে হৃদয়ের সবকটা বন্ধ কপাট একসঙ্গে খুলে দিয়ে তার অতীত দিনের অবিশ্বাস্য কর্মশক্তির অলীক কাহিনীগুলো তুলে ধরলো।

এ কথারও কোন উত্তর না দিয়ে তেমনি ভাবেই চোখ বুজে আরাম উপভোগ করতে লাগলাম। আমার কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাড়া অথবা উৎসাহের অভাবে তার কথা ফুরিয়ে গেলো। আবার আগের মতো উসখুস্।

: কি-রে, কিছু বলবি ?—এবারে প্রশ্ন করতে বাধ্য হোলাম।

: আজ্ঞে তেমন কিছু না—সলজ্জ বিনীত উত্তর।

বুঝলাম ওর আসল বক্তব্য জোরালো ভাবে পেশ করবার জন্যেই এতোক্ষণের এই গৌরচন্দ্রিকা।

: তবুও কী ? শুনি।

: মানে ইয়ে তেমন কিছু না। এই গোটা পাঁচেক টাকা—আমতা আমতা জবাব দিলো।

: টাকা ! কেন ? হঠাৎ আবার টাকার এমন কী দরকার হোল ?—রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করলাম।

: আজ্ঞে, ভীষণ দরকার। জামাইটার শক্ত অসুখ, কিছু ফল-ফলারি কিনে পাঠাবো।

: আমার কাছে টাকা ফাকা নেই। আমি কী টাকার পাঁচটা গাছ লাগিয়েছি যে নাড়া দিলেই পড়বে ? এই তো কদিন আগে তিন টাকা নিলি। আমার কাছে এখন পয়সা কড়ি একদম নেই।

: বড্ডো দরকার বাবু!—বুদ্ধু নাছোড়বান্দা. থিতিয়ে থিতিয়ে বললো আবার।

: বললাম তো ওসব হবে না এখন।—ধমকের সুরে উত্তর দিলাম, আমার কাছে এখন কিছু নেই। তোর মা এলে নিস।

সে আর কোন কথা না বলে সঙ্গে সঙ্গে আমার পদচ্যুত হোয়ে ভারি মুখে বাজারের থলে হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো।

আমিও বিছানার ওপর উঠে বসলাম। বুদ্ধু-পরিবেশিত খাবারের সদ্ব্যবহার করতে যাবো এমন সময় মণিকার আবির্ভাব। মণিকা আমার

পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। সেকেণ্ড ইয়ার আর্টসে পড়ে ভিক্টোরিয়ায়। আধুনিকা সুন্দরী, সুগায়িকাও। তার প্রতি আমার একটু বিশেষ পক্ষপাত গৃহিণীর দৃষ্টি এড়ায় নি। তাঁর তীব্রদৃষ্টি ওর ওপর। তদনুচর শ্রীমান বুদ্ধুচরণ আরো বেশি সতর্ক ও সচেতক মণিকা সম্বন্ধে।

মণিকা চোখ নামিয়ে হাসির লহরা তুলে বললো, উঃ। অতোগুলো লুচি আপনি একলা খাবেন বুঝি?

: একলা কেন, এসো শেয়ার করো।

: উহুঁ:। যেচে বুঝি কেউ কারু নেমন্তন্ন নেয়? ঘাড় দুলিয়ে মুচকি হাসির খোঁচা মেরে বলে মণিকা।

: বেশ, অপরাধ স্বীকার করছি। বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করলাম। হোয়েছে তো? নাও, এবারে খাও।

: উঁহু। —টানাটনা ডাগর চোখ দুটোয় স্নিগ্ধ আবেশ ঘনিয়ে এলো।

দাঁড়াও তবে, মজা দেখাচ্ছি।—বিছানা থেকে উঠে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এলাম। নিজেকে হাল্কাভাবে ছেড়ে দিয়েছে আমার ইচ্ছের কাছে। নিজের হাতে মণিকা একখানা লুচি তুলে মুখে পুরে দিতে যাচ্ছে এমন সময় দরজার পাশে বুদ্ধুর দর্শন। মেঘগম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলো, এ বেলা ভাত খাবেন, না রুটি?

বিনামেঘে বজ্রাঘাত। মণিকাকে ছেড়ে তৎক্ষণাৎ ছিটকে সরে গেলাম দূরে। সেও অপ্রস্তুত হোয়ে লজ্জায় অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলো পাথরের মতো।

বুকের অস্বাভাবিক কাঁপন ঢাকবার জন্যে বেশ চড়া গলায় প্রশ্ন করলাম বুদ্ধুকে, বাজার যাস নি?

সে কোন উত্তর দেবারও প্রয়োজন বোধ করলো না।

নিজের গলা নিজের কাছেই যেন কেমন বেসুরো লাগে। কৈফিয়ৎ তলব করবার দৃপ্ত দৃঢ়তা সে স্বরে ফোটে নি। বুদ্ধুর নিরুত্তর স্পর্ধা আমায় আরো দুর্বল করে ফেলেছে। ভিজে গলায় মিঠে সুরে তার প্রশ্নের জবাব দিলাম, ভাত হোলেও চলে, রুটিতেও আপত্তি নেই।

যা হয় রাঁধ না, তোর যেটায় সুবিধে।

বৃদ্ধ তবুও নিরুত্তর। ধারালো দৃষ্টিতে মণিকার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলো।

আমি পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বার করে তার দিকে বাড়িয়ে বললাম, এই নে, জামাইকে বেশ ভালো ভালো টাটকা ফল কিনে দিস।—পকেট থেকে আরো পাঁচটা টাকা বার করে আগের কথার জের টেনেই বললাম, এই যে ধর। আর এই দিয়ে মিষ্টি কিনে তোর ছেলেপুলেদের হাতে দিস।

তবুও সে হাত বাড়ালো না। চোখে তারায় কেবল মিটিমিটি হাসির ছলক।

আমি প্রসারিত হাতে টাকা নিয়ে শুধু তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম।

নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে

তপেন দাস

নক্ষত্রের নিভন্ত চিতার আগুন। ঠাণ্ডা হিম রক্তের মত বালুচর। রোমশ অন্ধকার। শুধু সমুদ্রের ঢেউগুলো অদ্ভুত এক আওয়াজ তুলে ছুটে চলেছে। সে আওয়াজ সাপের শিসের মত অন্ধকারের বুক চিরে চিরে যাচ্ছিল। চতুর্দিকে বালি—শুধু বালি, আর একটা কঙ্কালসার কৃষ্ণচূড়ার গাছ মৃত শাখা প্রশাখাগুলো আকুলভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশের দিকে।

একদিন একটা সুন্দর অস্পষ্ট ছবি দেখেছিল শতায়ু নরসুন্দর। আবার সূর্য উঠেছে ঝকঝকে উজ্জ্বল এক সূর্য। আর তাকে ঘিরে উড়ছে এঝাঁক নীল পাখী। কিন্তু হায়, কোথায় যে হারিয়ে গেল সেই ছবিটা। অন্ধকার বালির উপর হাঁটতে হাঁটতে নরসুন্দর দেখলে উত্তরের পথ দিয়ে এক যুবক আর যুবতী আসছে এইদিকেই। এ নিশ্চয় শঙ্করী, সঙ্গে লখিন্দর। প্রায় একশ' বছর আগে নরসুন্দর এমনি করে নূপুর বাজিয়ে আসতে দেখেছিল শঙ্খিনীকে। তখন নায়ক ছিল ভৈরব সর্দার। তার কিছু আগেও সূর্য উঠত।

এ সেই দ্বীপ। সীমাহীন সমুদ্রের বুকে পান্নার মত এর চেহারা। এখানে সূর্য নেই। সূর্য উঠে না কোনদিন। তাই অন্ধকার ঢেকে রেখেছে চতুর্দিক। শুধু নক্ষত্রের আগুনে পথ চলা। লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র। দ্বীপবাসীর বুকের বেদনা নিয়ে অসংখ্য অশ্রুবিন্দু ফুটে উঠেছে আকাশের শিয়রে। কোথায় চাঁদ? চাঁদও নেই। কারণ, আজ আর তাকে নাকি কেউই ভালবাসতে পারে না।

নূপুরের নিক্কণ বাজিয়ে মেয়েটা ভেঙে পড়ল মানুষটার কাঁধে।

'ওগো একটা সূর্য আনতে পার না তুমি? আর যে অন্ধকারে থাকতে পারি না! বল না—কবে তুমি সূর্য এনে দেবে?

লখাইয়ের পেশীবহুল হাত বিন্যস্ত হল শঙ্করীর কাঁধে। এগুতে এগুতে দৃপ্তকণ্ঠে বললে,—'কোনদিনই যাব না আমি সূর্য আনতে।

—তাহলে? এমনি নক্ষত্রের আগুনে ডুবে থাকবো আমরা!

—না, সূর্য আমি গড়ে নেবো—নূতন করে—এইখানে। কে?

—আমি নরসুন্দর। এ দ্বীপের সবচেয়ে প্রাচীন মানব।

—ও। কিন্তু, তুমি আমাদের চিনলে কি করে?

—তোমাকে চিনবো না? তুমিই ত' অষ্টম সর্দ্দার লখাই। এ দ্বীপে মানুষ আছে অজস্র। কিন্তু, মানুষের মত মানুষ হলে তুমি। তাছাড়া, তুমি যে সূর্য সৃষ্টি করবে।

—থাক্। আচ্ছা নরসুন্দর তুমি ত' দক্ষিণের পথে এলে—পথের মধ্যে যে কৃষ্ণচূড়ার গাছটা আছে—তাতে কি কোন মঞ্জরী দেখেছ?

—না সর্দ্দার। কিন্তু, কেন বলত?

—আমি জানি নরসুন্দর, ঐ কৃষ্ণচূড়ায় প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় যেদিন রক্তাক্ত মঞ্জরীর আগুন ফিন্‌কি দিয়ে উঠবে—সেদিন সূর্য উঠবে আবার।

—সত্যি!

—হ্যাঁ শঙ্করী। চলো এগোই। আর নরসুন্দর, তুমি সকলকে বুঝিয়ে বল, ওরা যেন সুন্দর ময়ূর আর হরিণগুলোকে অমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা না করে। আর ঝর্ণার জলে বাঁধা না দেয়। —তাহলে কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যাবে সব। —চল শঙ্করী।

সেই দ্বীপ।

শোনা যায়, কোন একদিন ছিল, যখন সত্যই সূর্য্য উঠত এখানকার আকাশে। সেদিন এখানকার ক্ষেতে ছিল সোনালী ফসল—ঝর্ণার জলে ছিল অজস্র মাছ আর ছিল গান—রক্তাক্ত কৃষ্ণচূড়ার গান। তারপর। ঐ নীল সমুদ্রটা পেরিয়ে এল কয়েকজন শ্বেতকায় মানুষ ভেলায় চড়ে। তারা হাতে নিয়ে এসেছিল চাবুক। দ্বীপবাসীর পিঠে সে চাবুক আর্তনাদ তুললে। যত ইজ্জৎ যত শক্তি ছিল, সমস্ত কেড়ে নিলে। শেষে সূর্যটাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেল তারা স্বর্ণদ্বীপে। এখানকার

মাটি বুক ফাটিয়ে কাঁদলে সেদিন। তারপর অন্ধকারে তলিয়ে গেল। সেই থেকে চারদিকে শুধু রাশি রাশি অন্ধকার।

ভৈরব সর্দ্দার? সে বললে, স্বর্ণদ্বীপে যাবে। কেড়ে নিয়ে আসবে সূর্যকে। সাজ সাজ রব। একসঙ্গে সাতটা ভেলা ভাসল অসীম নীল জলে। স্বর্ণদ্বীপে গেল তারা। কিন্তু আর ফিরল না।

শুধুমাত্র ভৈরব নয়। মৈনাক, সিংহবাহু, একে একে হারিয়ে গেছে সাতজন জোয়ান সর্দ্দার। সবাই গেছে সূর্য আনবে বলে। কেউ ফেরেনি। দ্বীপবাসীরা জানে স্বর্ণদ্বীপ সোনায় মোড়া। এদেশের শ্যামল মানুষ সেখানে সোনা হয়ে যায়। তারা সবাই স্বর্ণদ্বীপের চিরনীল আকাশের রোদে অজস্র নীলকণ্ঠ পাখীর ঝাঁক দেখে ভুলে যায় সূর্য নিয়ে দেশে ফেরার কথা।

কিন্তু আজ আবার ব্যতিক্রম ঘটল। অষ্টম সর্দ্দার নতুন করে ভেলা ভাসাল না। শুধু বললে, সত্যিই যদি সূর্য চায় লোকে, তবে ময়ূর শিকার চলবে না। আর চলবে না ঝর্ণার স্বচ্ছ সাবলীল ভঙ্গিকে রুদ্ধ করে দেওয়া। পুরানো সূর্যকে আনতে যাব না আমরা স্বর্ণদ্বীপে। বরং যেদিন ঐ কৃষ্ণচূড়া গাছটার শাখা-প্রশাখায় রক্তাক্ত মঞ্জরীর আগুন ফিন্‌কি দিয়ে উঠবে, সেদিন নূতন সূর্য গড়ে নেবো।

নতুন সূর্য?

বুঝি তাই। নতুন সূর্যের লোভে দলে দলে এলো সবাই লখাই সর্দ্দারের পাশে। দেখতে দেখতে পড়ে থাকা জমির বুকে লাঙ্গল কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল যত জোয়ান ছিল দ্বীপে। যুবতীরাও এলো তাদের পাশে। তারা ক্লান্ত পুরুষের পিপাসা মেটাতে লাগল আজলা ভর্ত্তি জলে। সেই অন্ধকারে নরসুন্দর দেখলে, তারার আগুনে নাচছে যত ময়ূর ছিল বনে।

সেদিন রাতে যখন আকাশের দিকে দিকে পুড়ছে অসংখ্য নক্ষত্র, নিচে নীল সমুদ্রটা ফুঁসছিল। নক্ষত্রের সেই মরা জ্যোৎস্নায় হঠাৎ বহুদূরে সমুদ্রের বুকে ভেসে উঠল একটা কালো বিন্দু।

নীল সাগরের উচ্ছ্বাসকে ডিঙ্গিয়ে বিন্দুটা ক্রমশঃ ছুটে আসতে লাগল

কিনারার দিকে। দেখতে দেখতে বড় হয়ে দেখা দিলে একটা ভেলা আর একটা মানুষ। শেষে ভেলা সমেত লোকটা এসে নামল নির্জ্জন বালির কিনারাতে। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ভেলাটা আরো খানিকটা টেনে এনে লুটিয়ে পড়ল। তার সারা শরীর থেকে অদ্ভুত একটা লাল আগুনের আভা ছড়াতে লাগল। দেখতে দেখতে খবরটা রটে গেল।

ছুটে এলো সবাই। এমন কি নরসুন্দরও। সবাই ঘিরে দাঁড়ালো তাকে। নরসুন্দর বলে উঠল, এ যে অর্জ্জুন!

হ্যাঁ, আমি সেই সপ্তম সর্দ্দার অর্জ্জুন।

মানুষটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। লখাই হঠাৎ চিৎকার করে উঠন,—খবরদ্দার। কেউ ছোঁবে না ওকে। যে ছোঁবে তার নির্ঘাত স্বর্ণরোগ হবে।

সবাই ভাল করে তাকিয়ে দেখলে, সত্যিই অর্জ্জুন সর্দ্দারের গায়ে এখানে ওখানে চক্‌চক্‌ করছে সোনা। স্বর্ণদ্বীপে গিয়ে স্বর্ণকীট বাসা বেঁধেছে অর্জ্জুন সর্দ্দারের সারা গায়ে। সারাটা গা থেকে তাই লালচে একটা আভা ফুটে বেরুচ্ছে। অর্জ্জুন চিৎকার করে উঠল, ছোঁবে না কেন? —এটা কে রে?

—আমি অষ্টম সর্দ্দার লখাই।

—তোর আগের সর্দ্দার আমি। এ সোনা-রোগ বুঝলি। হতে পারে রোগ, তবু স্বর্ণকীট আমার গায়ে আস্তানা নিয়েছে—এ রোগের জন্যে মেহনৎ করতে হয়। তোদের কাঁধে ওগুলো কিরে?

—লাঙ্গল।

—লাঙ্গল কেন?

—ফসল ফলাবে লখাই সর্দ্দার।

—ছোঃ, ফসল ফলাবে! এই ফ্যাল সবাই লাঙ্গল—চল সব বনে যাবো, হরিণ মারব ময়ূর মারব—মাংস খাবো। চল চল সব। চল সবাই, নাচা-গানা হবে। হেই জোয়ান চল। কোমর থেকে একটা পাত্রের ছিপি খুলে ঢক্‌ ঢক্‌ করে কি খানিকটা গলায় ঢেলে দিলে অর্জ্জুন সর্দ্দার। ছুঁড়ে দিলে সবাইকার দিকে। তারপর টলতে টলতে এগিয়ে

চলল। ওর পেছনে পেছনে চলল সবাই। লখাই সর্দ্দার চীৎকার করে উঠলো, সাবধান অর্জ্জুনের গায়ে স্বর্ণকীট—বড় ছোঁয়াচে। তোরা ময়ুর মারিস না ওর কথায়।

অর্জ্জুন উত্তর দিলে, ছোঃ! ফসল ফলাবে! আয় মাংস খাবি। নাচ গান হবে।

কোথায় কি হয়ে গেল। সবাই দল বেঁধে চলে গেল অর্জ্জুনের পেছনে পেছনে—বনে। নরসুন্দর শুধু রয়ে গেল। দেখতে দেখতে রক্ত বন্যা বইল বনে। হরিণ ময়ুরের আর্ত্ত চিৎকারে ভরে গেল চারিদিকের আকাশ বাতাস। খুব অল্প সময়ের মধ্যে চেহারা পালটে গেল দ্বীপের। মেয়েগুলো পর্যন্ত পাল্লা দিয়ে ছুটল বনে—শিকারের মজা লুটতে। তারপর ?

তারপর, সে রাতে একদল আগুনের ফুল্‌কি ছড়িয়ে পড়ল উত্তরের বনভূমিতে। অসংখ্য পুরুষ আর নারী কণ্ঠের মিলিত কণ্ঠস্রোত বয়ে চলল চারিদিকে। মাথার ওপরে মসীলিপ্ত আকাশ। সূর্য হয়ত আর কোন দিনই উঠবে না। কোনদিনই আর নীলকণ্ঠের ঝাঁক উড়বে না এ দ্বীপের আকাশে। রুদ্ধ হয়ে গেছে সেই পথ। লখাই এগিয়ে চলল সেই উল্লসিত প্রান্তরের বুকে।

অবাক চোখে এসে দাঁড়ালো সে। দেখলে, একটা আগুনের কুণ্ডলীতে পুড়ছে কটা হরিণ আর ময়ুর। দলে দলে সেই রক্তাক্ত কুণ্ডলীকে ঘিরে নাচছে সবাই। অর্জ্জুন সর্দ্দারের সঙ্গে কোমর জড়িয়ে নাচছিল একজন যুবতী। লখাইকে দেখে ডাকলো, এসো সর্দ্দার, মজা লিয়ে যাও। লখাই অবিচলিত। সে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে দেখলে, সবার গায়ে ধরেছে সোনারোগ—স্বর্ণকীট বাদ দেয়নি কাউকে। এমন কি শঙ্করীকেও না। তখন কোমরের বস্ত্রখণ্ড ছুঁড়ে ফেলেছে সবাই, দ্রুত পায়ে চলছে নাচ—মত্ত হয়ে উঠেছে আগুনের জিহ্বা—সহসা দু'হাতে মুখ লুকিয়ে লখাই ছুটল—ছুটল সীমানা ছাড়া কোন জগতের পথে। এখানে নয়। আর সূর্য উঠবে না।

লখাই ছুটছিল।

দেখতে দেখতে বহু প্রান্তর পেরিয়ে সেই নক্ষত্রের মৃত জ্যোৎস্নায় সে এসে দাঁড়ালো অতি পুরানো কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। অনেক যুগের পরে একটা বিরাট আশ্চর্য ধরা দিয়েছে তার চোখে। লখাই চোখ ভরে দেখলে, সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছটার প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় রক্তাক্ত মঞ্জরী গেছে ভরে—লক্ষ লক্ষ আগুনের শিখা যেন ফিন্‌কি দিয়ে উঠেছে আকাশের দিকে। সূর্য উঠবে। সূর্য!!

মুহূর্তের মধ্যে সে পাড়লে একরাশ লাল কৃষ্ণচূড়ার ফুল। তারপর বিশাল নীল সমুদ্রটার কিনারে এসে দাঁড়াল। অজস্র নীল জলরাশি ফুঁসছে। মাথার উপর অগুনতি নক্ষত্র। বালির পাড়ে দাঁড়িয়ে দ্বীপের একমাত্র জোয়ান লখাই সর্দার। মাথায় তার কৃষ্ণচূড়ার মুকুট। দূরে বনের আকাশে লাল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ লখাই দেখলো কালো মেঘের পর্দা ছিঁড়ে উঁকি দিয়েছে একটা আশ্চর্য চাঁদ। সামনে নীল অগাধ জলরাশি। সেই জ্যোৎস্নাধারা ধীরে ধীরে আসতে লাগল বালীর পাড় দিয়ে। লখাই সোজা হয়ে দাঁড়াল সুঠাম দেহে। দু'হাত আঁজলা করে সে পান করতে লাগল সেই জ্যোৎস্না। তারপর সেইভাবেই হাঁটু গেড়ে বসল।—শুয়ে পড়ল বালির ওপর। ওদিকে যেখানে বনে হরিণ পুড়ছে সেখান থেকে একটা দমকা বাতাস উঠল সহসা।

সেই বাতাস ছুটে এসে লাগল শায়িত মানুষটার গায়ে। দেখতে দেখতে লখাইয়ের দেহের সব মাংস খসে পড়ল বালিতে—বালি হয়ে গেল। শুধু শুকনো বালির উপর পড়ে রইল একটা কঙ্কাল—মাথায় লাল কৃষ্ণচূড়ার মুকুট।

তখন দূরে বনান্তরে বিচ্ছিন্ন মিলিত কণ্ঠের উল্লাস। এদিকে অজস্র জ্যোৎস্না নেমে আসছে আকাশ থেকে। শুধু লখাইয়ের কঙ্কালটাকে ঘিরে বসেছিল—যা সে জীবন দিয়ে খুঁজেছে সেই এক ঝাঁক নীলকণ্ঠ পাখী।

দেখা

যশোদা জীবন ভট্টাচার্য

রাস্তায় দাঁড়িয়ে কে কাকে ডাকছে। নিশ্চয়ই ভদ্রলোক। এ পাড়ার বাসিন্দে হয়তো না। হলে কি আর অমন করে নিজেকে আড়ালে রেখে চেঁচায়? এতক্ষণে দুপ-দাপ পা ফেলে ভেতরে চলে আসার কথা। সাড়া না দিয়ে, শব্দ না করে সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়াই হচ্ছে রীতি। অন্তত রমণী তাই মানে, প্রতিবাদ না করে মেনে নিতে চায়। মনোভাব নীহার কি একটু আধটু আন্দাজ আর করে না? করে। তবুও কেমন শুষ্কং কাষ্ঠং গোছের ভাব। নিজেকে ঢেকে-ঢুকে লুকিয়ে রাখার এক বিশ্রী, কদর্য সংযম। এখানে যা অশোভন অসামাজিকতা ছাড়া কিছু না। বনে বাস করে বনের মানুষ হ'ব না, তাই কি হয়? অমন আবদার চলে কদিন? দুদিন কিংবা দু'বেলার জন্য অতিথি হয়ে আসেনি তো নীহার। এসেছে দীর্ঘদিন-মাস-বছরের মেয়াদ নিয়ে। ছুটি নিয়ে শখ করে বেড়াতে আসা নয়। তাহলে আর রমণীকে কষ্ট দেয়া কেন?

এমন করে তিলে-তিলে মেরে ফেলার দুঃসাহসিক বাসনা হয় কার লোভে, কার মুখ চেয়ে?

'এঘরে না।'

'তবে আমি কোথায় যাই?'

'বাইরে, বাইরে যান আপনি।'

'কেন, তুমি কি ব্যস্ত? ভয়ানক ব্যস্ত এখন? মোটা পয়সা পেলেও ব্যস্ত থাকবে নাকি?'

'এটা গেরস্তের ঘর।'

'ধাঃ বাবা! এ যে ল্যাংগোটের বুক পকেট! হাফ গেরস্ত পাড়ায় আবার গেরস্ত গজিয়ে উঠল কবে?' বিড়-বিড় করতে করতে লোকটা

এগিয়ে যায়। মুখে-চোখে বিরক্তি আর ধরে না। বিক্ষোভের অন্ত আর নেই। রমণী টের পায়। অন্ধকার ঘরের ভেতরে শুয়ে গজ-গজ করে। কাঁথাবালিশের তেলচিটে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কান্না আসে তার। একা-একা নিজের হাত-পা কামড়ে হাড়-মাংস-রক্তের স্বাদ নিতে ইচ্ছা করে কেবল। আর নীহার? লোকটার বোকামি দেখে মুখে আঁচল গুঁজে দিয়ে হাসতে-হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রায়। বড় মেয়েটা সামনে দাঁড়িয়ে। নইলে বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত করে ছাড়তো।

সেই নীহার আজ একা যায়। প্রতিবাদ না করে ডাকে, 'এসো। মনে পড়ল তাহলে? আমি ভাবলাম পথ খুঁজে আর পাবে না।'

এক সঙ্গে এত কথা। অভ্যাস তো নেই। হাঁপ ধরে না বুকে? পুলকে গভীরভাবে নাড়া খেয়ে রমণী ফের থমকে যায়। কান পেতে কথা শোনে আবার।

'তোমাকে ভোলা কি এতই সহজ?'

'এই, কবিত্ব শুরু করবে নাকি? তাহলে কেঁদে ফেলবো কিন্তু বলে রাখছি।'

'কান্না—ও আগে থেকে বলে-কয়ে নোটিশ দিয়ে কাঁদো বুঝি?'

শুনে মুসড়ে পড়ে নীহার। লজ্জায় অধোবদন। কান্না যে খাঁটি প্রাণের নয় তা কি সবাই টের পায়? রমণী-ও? ঘরে-বাইরে সে কেবল অবিশ্বাস আর অবহেলাই কুড়িয়ে যাবে চিরকাল? নইলে শুরুতেই কান্না নিয়ে ঠাট্টা শুরু করে চিত্ত? তাকে অবিশ্বাস করে মজা পায়? নাকি মজা পাবার লোভে অবিশ্বাস করতে চায় ঠিক বোঝে না নীহার।

কাঁদি আর কোথায়?'

'তবে?'

'তোমাকে দেখেই কান্না পাচ্ছে আজ।'

চিত্ত বুঝি উদাস হল শুনে। তাকে আনমনা, উদ্‌ভ্রান্ত দেখায়। চোখের সামনে কেমন এক ভোজবাজি শুরু হয়ে যায়। এতবড় বিশাল, বিপুল কলকাতা পলকে, প্রকাশ্য দিবালোকে মিথ্যে হয়ে শূন্যে মিলিয়ে

যায়। সব কথা, সমস্ত শব্দ মুহূর্তে মলিন হয়ে আসে। ঠাকুরপুকুর, রায়সাহেবের ভিটে পেরিয়ে, পরীরবাগান, বাঁশ ঝোঁপ পিছে রেখে সে রাখুজ্যেঠার উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘুঘু ডাকছে কোথায়। রোদ এখন টিনের চাল বেয়ে শিশিরের ফোঁটার মত টুপ-টাপ নীচে ছাঁচতলায় ঘাসের ডগায় জমা হচ্ছে ধীরে ধীরে। তারের ওপর লাল-নীল ডুরে শাড়ি মেলে দিয়েছে কে। হাওয়ায় জলের আবছা, অস্পষ্ট ঘ্রাণ নিতে-নিতে চিত্ত আজকে-ও ভুলে যায় এমন করে এই সকালবেলা পোষ্ট-আপিসে যাবার অছিলায় এখানে আসা। চুপি-চুপি নীহারকেই দেখতে আসা তার। আর যে-কথাটা হাজার চেষ্টা করে-ও বলা যাচ্ছে না, মরিয়া হয়ে সেই সাংঘাতিক রক্ত তোলপাড়করা কথাটাই বলার বাসনা আজ। কিন্তু নীহার কোথায়? চিত্ত সম্মোহিতের মত ভেজা শাড়ি দেখে। শাড়ির গায়ে ঠিকরে পড়া রোদ। মুখ-চোখ আরক্ত, উষ্ণ মনে হয়।

মেঘ না চাইতে জল। সেদিন কথা বলেছিল নীহার।

'যাবে, আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে কোথাও?'

ভড়কে গিয়ে ছিল চিত্ত। মাথার ভেতরে চিন্তা-ভাবনার খেই হারিয়ে ফেলছিল। কাটা, ছোঁড়া সুতোগুলিই একটার গায়ে আরেকটা লেগে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল কেমন। বলতে পারেনি। সহজ, সত্য কথাটাই স্পষ্ট করে বলার সাহস ছিল না সেদিন। বরং মিষ্টি হাসি দিয়ে ভেতরের ভয় আর অসহায়তা আড়াল করে বলেছিল, দাঁড়াও, আর ক'টা দিন সবুর কর।'

'তার মানে তুমি বড় হবে, বড়লোক হবে তারপরে আমাকে নিয়ে দেশান্তরী হবে। তাইনা?' জ্বলে উঠেছিল নীহার। 'ভীরু, কাপুরুষ কোথাকার!'

চিত্ত এখন এই সব পুরনো কথাই ভাবে।

'কী ভাবছো?' নীহার প্রশ্ন করে।

'কী আবার?'

চিত্ত হাসে। হাসিটা কষ্টের। নীহার টের পায়। তাকে-ও

ভয়ানক বিষণ্ণ ক্লান্ত মনে হয়। হাল ভাঙ্গা, পাল ছেঁড়া দুটি নৌকো অনেক ঝড়—সয়ে-সয়ে আবার এক নির্জন, নিঃসঙ্গ দ্বীপের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখা যে হবেই এমন কথা যেন ছিল না। তবু হয়েছে। তাই বলে আনন্দ নেই। আবেগে, উচ্ছ্বাসে বিচলিত হবার, বিস্মিত হবার উত্তেজনাটুকু অবধি নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন আরেকটা ঝড় উঠলেই নিশ্চিন্ত হতে পারে। বিচ্ছিন্ন হবার মত সুখ যেন আর নেই।

দু'পাশে টালির চাল, ছিটে বেড়া। নীচু ঘর। বুকে হেঁটে চলতে হয়। সরু গলিরমুখে নোংরা, ছেঁড়া চটের পর্দা। পর্দা সরিয়ে চিত্ত ভেতরে যায়। ঘরের মেঝেয় দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। গুমোট, অন্ধকার হয়ে আছে সব। নজর কাড়ে না কিছুই। তাছাড়া দেখার কী আছে? ছেঁড়া মাদুর, কম্বলের স্তূপের আড়ালে ওই তো ভূতের মত লোকটা। সারা দেহে দুটিমাত্র চোখ সম্বল নিয়ে চিত্তকেই দেখছে সে। সে চোখে আশা-ভরসার লেশমাত্র নেই। কেবল ক্ষুধা। সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে রমণী যেন লেহন করে চলেছে তাকেই।

'আমি চিত্ত। পীরপুরের ঘোষাল বাড়ি ছিল আমাদের।'

'আসুন আসুন।' উৎসাহে, রমণী যেন ভরিয়ে তোলে ঘর। মেঝেয় মাদুর পাতা। বসতে বলে চিত্তকে।

পা নেই। সে খবর অনেকদিন আগেই শুনেছে চিত্ত। রেল লাইনে গলা দেবার বাসনা ছিল না রমণীর। পেটের দায়ে ফেরিওলা সাজতে হয়েছিল তাকে। এখন ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে ঘর নিতে হয়েছে.

'কেন এলে বলবে না?'

এক সময় নীহার কাছে আসে। প্রায় না শোনার মত গলা করে কথা বলে। দম বন্ধ হয়ে আসছিল চিত্তর। চিন্তা করে জবাব দিতে হয় তাকে। বলে, 'যদি বলি তোমাকেই দেখতে এসেছি নীহার।'

'এখনো বিশ্বাস করতে হবে একথা?'

নীহার আজ প্রাচীনার মত কথা বলে। দীর্ঘদিন-মাস-বছর পেরিয়ে সে আজ অন্য মানুষ। বিশ্বাস অবিশ্বাসের ক্ষেত্র অবধি পাল্টে গেছে

তার। কথা শুনে চিত্ত তাই থমকে যায়। অন্ধকার চোখে সয়ে এলে একে-একে দেখতে পায় সব। এক পাশে পাকানো বিড়ি, বিড়ির পাতা, সুতো, তামাক আর কুলো পড়ে আছে। কাজ করতে করতে উঠে গেছে নীহার। চিত্ত না এলে এখন কাজ করতে হত।

'সুখে আছো তো ?'

'সুখ কাকে বলে ?'

নীহার বুঝি বাঁকা ছাড়া কথা বলবে না আজ। মনে-মনে অপ্রস্তুত বোধ করে চিত্ত। চেয়ে দেখে, শুধুমাত্র হাতের ওপর ভর দিয়ে কেমন দ্রুত গড়াতে গড়াতে বাইরে চলে যাচ্ছে রমণী। সে কি তবে টের পায়, নীহারের সঙ্গে চিত্তর আলাপ কত জরুরি, কত গোপনীয় ? কিন্তু চিত্ততো কোন আশা নিয়েই আসেনি। বোঝাপড়ার বিন্দুমাত্র নেই তার। কেবল দেখতে আসা নয়। তাছাড়া দেখাবার কী-ই বা আছে তার ? শোনাবার মত আর কী খবর আছে ? নীহারের মত চিত্ত নিজেই কি জানে সুখের চেহারা কেমন ? কিসে সুখ ?

'বিয়ে করেছো ?'

এবার স্পষ্ট করে কথা বলে নীহার।

ঘাড় কাত করে চিত্ত।

'কোথায় আছো ?'

'এখন তোমার কাছে ?'

'হেঁয়ালি রাখো। বউ কোথায় ?' অকারণ ঘর গুছাতে ব্যস্ত হল নীহার। তাকে দেখে চিত্তর মায়া হয়। এই নীহার তার হত। সহজেই সে নীহারের হয়ে যেতে পারতো। এমন দুর্ভাগ্যের জীবন কে চেয়েছিল ? এমন ছন্নছাড়া কপাল ? নীহার নিজেই কি তাকে ছেড়ে রমণী সংসার সন্তান চেয়েছিল ? অভিমান হতে থাকে। কাকে যে দায়ী করবে ভেবে পায় না চিত্ত। চোখের সবাই সমান। মা-বাবা, রাখুজ্যেঠা, নীহার, এমন কি সে নিজে। সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার জন্যে মানুষ নিজেই কি দায়ী নয় ?

'বউয়ের কথা থাক। তোমার মেয়ে আছে শুনেছিলাম। সে

কোথায় নীহার ? বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। সে কোথায় ডাকো।'

নীহার বোঝে, কিছু গোপন করতে চাইছে। নিজেকে লুকোতে চাইছে চিত্ত। সে তাই উচ্চবাচ্য করে না। অযথা পীড়ন করে আসল কথা আদায় করে নিতে চায় না। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে, 'একটি নাকি। আর শুধু মেয়ের মা হয়েছি ভেবেছো ? ছেলে নেই আমার ? ছেলে-মেয়ে দিয়ে ঘর ভরে ফেলেছি।'

তবু ভাবতে হয়, নীহার কি তৃপ্ত ? হয়তো না। সুখ আর তৃপ্তি কি সমার্থক ? চিত্ত মনে-মনে মাথা নাড়ে। কক্ষনো না। তৃপ্তি যে শেষ। তৃপ্তির অন্য নাম মৃত্যু। চিত্ত মরেনি। তাই এখনো অতৃপ্ত, তৃষিত, অসুখী।

'মা।' বাইরে দাঁড়িয়ে পোকা ডাকে।

'ঘরে আয়।'

চিত্ত চেয়ে থাকে। নীহারের মেয়েকে দেখে। যেন সেই সহজ, সরল, গ্রাম্য বালিকা। হুবহু নীহারের ছাঁচে গড়া। রমণীর সঙ্গে মিল বলতে কিছু নেই।

'আমাকে প্রণাম করো।'

দ্বিধা নেই পোকার। চিত্তর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়। আর চিত্তর বুকের ভেতরে কষ্ট হতে থাকে কেমন। এখন আর সে বোঝে না, এখানে কেন আসা। কার জন্যে এতদিন পরে ছুটে আসা এখানে। সে কি পোকা, না নীহার ?

'চলি।'

'দাঁড়াও, চা খাবে না ?'

'কী দরকার ?'

'আর কিছু তো খাওয়াবার সাধ্য নেই আমার।' যেন অকপটে নিজেকে মেলে ধরল নীহার গোপনতার আড়াল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে এল হঠাৎ 'কেউ এলে চাটুকু-ও দিই না। বরং তারা দেয়। কিছু দিয়ে পেতে চায়। আমি পারি না, সহ্য করতে পারি না তাদের। বিশ্বাস করো, তোমার কথা ভেবেই পারি না।'

শুনতে-শুনতে দম বন্ধ হয়ে আসে চিত্তর। দেহ-মন বিষাক্ত, অবশ হয়ে আসে। এই নীহারকেই কি দেখতে এসেছিল সে? এতকাল এই নীহারের স্বপ্ন দেখেই পাগল হতে চেয়েছে? তাছাড়া নীহার কি দেখতে পায় না, কাছে দাঁড়িয়ে অত বড় মেয়ে পোকা?

হাবার মত দাঁড়িয়ে কী শুনছিস লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে? এক কাপ চা নিয়ে আসতে পারিস না? লোকটা সেই কখন থেকে বসে আছে।

মেয়ের গালে থাস করে চড় কষিয়ে দিলে নীহার। তারপর স্থান-কাল পাত্র ভুলে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে। সে দৃশ্য দেখে চিত্ত। পোকা তার আগেই কাচের গ্লাশ হাতে বেরিয়ে যায়। রাস্তায় ক্ষুদিরামের চায়ের দোকান। বিনিপয়সায়, মাগনা চা নিয়ে আসতে হবে তাকে। মায়ের মত সে নিজেই কি পারবে না ক্ষুদিরামের কাছে অমন সহজভাবে লুটিয়ে পড়তে?

তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় পোকা।

আর ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে ভয়ে বিস্ময়ে কাঁপতে কাঁপতে চিত্ত দেখে দরজা-জানালাগুলি একে-এ‍ে বন্ধ করে দিচ্ছে নীহার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সত্যব্রত সেন

মিনুর চিঠিটা ততক্ষণে আমার পড়া শেষ হয়ে গেছে।

রমলাবৌদি এক থালা খাবার—মানে শশা, আনারস ইত্যাদি নিয়ে নীরব-ভঙ্গীতে ঘরে ঢুকলেন। দুচোখ তাঁর জলো জলো। খাবারের প্লেট ও জলের গ্লাস চৌকির উপর রেখে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে, আঁচল দিয়ে চোখগুলোকে আর একটু শুষ্ক করতে করতে বললেন,…… এই ব্যাপার নিয়ে মিনুর সংসারটা না ছাড়খাড় হয়ে যায়।

কোন্ প্রশ্নের মাধ্যমে রমলাবৌদির সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করব তা কিন্তু এখনও স্থির করে উঠতে পারি নি আমি।

রমলাবৌদিই বলে চলেছেন, ও নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে, আমি ওর ইচ্ছাই বাধা দিইনি।

সে কথাটা অবশ্য আমিও জানি। ঐ মিনুর বিয়ের পর মিনুর কাছে চিঠি লিখে দেওয়া, আর এক এক প্লেট খাবার খেয়ে খাওয়া আমার ইদানীংকালের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালেও মিনুর বিয়ের সময় আমি ছিলাম। শুধু ছিলাম না, অহেতুক সাক্ষীও দিয়েছি। বৌদি ওর বিয়েতে বিধবার শেষ সম্বল থেকে যথাসাধ্য খরচা করে মেয়ে-জামাইর যোগ্য সমাদর যে জানিয়েছেন সে কথা আমি ভালভাবে জানি।

সখেদে বৌদি মন্তব্য করলেন, এসব ছেলে বিগড়ে গেলে মেয়েদের খুব বিপদ।

আমিও জানি একথাটা। কেননা, আমাদের দেশে মেয়েদের সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তার হাওয়া এখনও নরম নরম। কিন্তু তবু কোন্ প্রশ্নটার সাহায্যে বৌদির সঙ্গে আজকের আলাপ শুরু করি তা ভাবতে লাগলাম। ভাবতে ভাবতেই খাবারের প্লেটটা দিয়ে টেনে নিলাম। দু-চারখানা শশা-আনারসের টুকরো মুখে পুরে দিতেই যেন

প্রথম প্রশ্ন স্থির হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, মিনু যা লিখছে, তা কি সত্যি ?

হ্যাঁ, এই প্রশ্নটা প্রথম হওয়া স্বাভাবিক। কেননা আমি জানি রমলাবৌদি হচ্ছেন পোষ্ট মাষ্টার সুরেনবাবুর স্ত্রী। সুরেনবাবু বছর দেড়েক হলো মারা গেছেন। তারপর থেকে রমলাবৌদি তাঁর মেয়ে মিনুকে নিয়ে সুখে দুঃখে এইখানেই আছেন। স্থানীয় সকলেই প্রায় তাঁর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন কাজেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাও রয়েছে বৈকি। বয়স এখন পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি।

অথচ রমলাবৌদি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ সত্যি।...

আমার এক প্লেট পরিপাটি খাবার খাওয়ার লোভ—সপ্তাহে মাত্র একটা চিঠি লিখে দেওয়ার বিনিময়ে, হঠাৎ ঠাকুরমা-চিন্তাধারার ঐতিহ্যবোধে আহত হ'ল। রমলাবৌদির এরকম ব্যাপার!

রমলাবৌদি বললেন, লিখে দাও ঠাকুরপো, এই সত্যির ভারী বোঝা নিয়ে ওকে স্বামীর ঘর করতে হবে।

আমি বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করলাম, কি বলছ ? কি বলতে চাইছ তুমি ?

রমলাবৌদি যেন বুক বেঁধে বলে যেতে লাগলেন, ১১।১২ বছর বয়সে আমার বিয়ে। স্বামী কি বা স্বামীর ঘর কি তা বুঝবার বয়স তখনো হয়নি, যখন বুঝতে শুরু করলাম, তখন বুঝলাম, স্বামী আর বুড়ো শাশুড়ীকে নিয়ে আমার খুব সুখের সংসার। গরু-ছাগল ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, কয়েক বিঘে ধানী জমি ছিল। জমি ভাগে চাষ হতো, যা ফলতো তার অর্ধেক আমরা পেতাম। তাতেই চলে যেত আমাদের।

একদিন গোলমাল লেগে গেল ওঁর খুড়শ্বশুরের ঘরের এক দেউরকে নিয়ে। খুব ভোরবেলা তখন প্রায় অন্ধকার—সে এসেছিল ওদের পুকুরে চুপিচুপি মাছ ধরতে। কিন্তু গৃহকর্তার কাছে এমন চৌর্যবৃত্তি ধরা পড়ে গেল খুড়তুতো ভাইকে প্রায় মারতে যায় আর কি। কেন, ওর কিছু মাছের দরকার থাকলে বলতে তো পারতো ? এরকম চুরি করা কেন ?

কিন্তু সেদিন খুড়তুতো ভাইকে ছাড়া আর না-ছাড়ার মধ্যে কোন মীমাংসা হলো না। অন্য একদিন, রমলাবৌদির একটি গরু দড়ি ছিঁড়ে ঐ খুড়শ্বশুরের শিমের খেতে গিয়ে পড়েছে। শিমের লতা বেশ খানিকটা খেয়েও নিয়েছে ইতিমধ্যে। এদিকে খুড়তুতো ভাই ভদ্রলোক টের পেয়ে এমন হৈহুল্লোড় করল যে, গরুর মালিক ছুটে না এসে থাকতে পারলেন না। তারপর দুপক্ষে তুমুল ঝগড়া। সেদিন মাছ চুরির প্রসঙ্গটাও এলো। ফল হলো, দুজনে মারামারি। রমলাবৌদির স্বামীর মাথা ফেটে একেবারে চৌচিড়। এই অজ পাড়াগাঁয়ে ভাল একটা ডাক্তার নেই, বৈদ্যি নেই। তদুপরি পুলিশের ঝামেলা। শেষ পর্যন্ত পরের দিন সকালে তাঁকে ইহলীলা সংবরণ করতে হয়েছে। রমলাবৌদি হতবুদ্ধি। এই তো মাত্র বছর তিনেক হয়েছে ওর বিয়ে হয়েছে। অর্থাৎ চৌদ্দ কি পনর বছর বয়স।

শাশুড়ী তারপরেও বছর দুয়েক বেঁচে ছিলেন। কোথায় টাকা পয়সা ছিল বৌদির জানবার কথা নয়। তিনি কি করে যে সংসারের দিনগুলো চালিয়ে নিতেন বৌদি তাও বুঝতে পারতেন না। বোধ হয় জমিজমাগুলো ধীরে ধীরে বিক্রী করে দিয়েছেন। কিংবা সহানুভূতির মুখোস পরা স্বার্থপর ভদ্র সন্তানেরা তাঁকে সাহায্যের নামে ধীরে ধীরে জমিজমা, পুকুরের মাছ ইত্যাদি বেহাত করেছে। গরু ছাগলগুলো তো সেই ঘটনার পর অর্থাৎ শ্রাদ্ধের দিন দান করে দিয়েছেন।

একদিন এই বুড়ো শাশুড়ীও শোকেদুঃখে ইহলীলা সংবরণ করলেন। অর্থাৎ রমলাবৌদি অসহায় অবস্থায় পথে দাঁড়ালেন আর কি!

তাহলে পোষ্টমাষ্টার?—আমাদের সুরেনবাবু? নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলাম এ পর্যন্ত শুনে!

কৌতূহল রোমাঞ্চকর হয়ে উঠল। চিঠি লেখা শুরু করিনি। এবং এ পর্যন্ত শুনে আর কোনদিনও চিঠি লিখব কিনা বা লিখতে আসব কিনা ভাবছি। একটি খাবারের প্লেট না হয় গেলই।

রমলাবৌদি বললেন, তোমাদের পোষ্টমাষ্টারের প্রতি আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা যেন চিরদিন অটুট থাকে।

পোষ্টমাষ্টারকে আমরা অশ্রদ্ধা করতাম না সে কথা আগেই বলেছি। রমলাবৌদির কথা শুনেও অশ্রদ্ধা আসে কি করে। পোষ্টমাষ্টার মিনুকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তাঁর আদুরে মেয়ে বলে; কিন্তু বৌদিকে পরিচয় করিয়ে দেয়নি কোনদিন। আমরা রমলাবৌদির সম্পর্কে অনুমান করেছি যে নিশ্চয় তিনি পোষ্টমাষ্টারের স্ত্রী এবং সে অনুযায়ী তাঁকে যোগ্য সম্মান দেখিয়ে এসেছি।

বৌদি বললেন, ওদের গ্রামে নতুন এক পোষ্টমাষ্টার বদলী হয়ে এসেছেন। তাঁর স্ত্রী তখন সন্তানসম্ভবা। একটি বছর সাতেকের মেয়েও আছে। খবর পাওয়া গেল যে তিনি একজন ঝি খুঁজছেন। বৌদি জানেন ভাই-এর সংসার নিজের সংসারের চাইতে কম কানা নয়। ছ'সাতটা কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে মুহুরীর কাজ করে সংসার চালানো শক্ত। তদুপরি দেশে বৃটিশের সঙ্গে জার্মানার নাকি যুদ্ধ লেগেছে। জিনিস পত্রের দর হুহু করে বেড়ে চলেছে। ওদেরই দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটা ভার। কাজেই বৌদি ভাবলেন, ভিনগাঁয়ের লোক পোষ্টমাষ্টারের ঘরে ঝি-গিরি করে নিজের বোঝা নিজে হাল্কা যদি করতে পারে মন্দ কি।

কিন্তু তাই বলে পাড়ার লোকেদের সুপারিশের জন্য ধরতে তিনি অনিচ্ছুক। কি যে একটা লজ্জা, সঙ্কোচ। তাছাড়া ক্ষোভও কম নয়। এইতো তোমার অসহায় বুড়ো শাশুড়ীকে পেয়ে, ধান পোকায় খেয়ে ফেলেছে বলে ধান দিয়েছ কম। কুপরামর্শ দিয়ে জমিগুলো বেহাত করেছ। পুকুরের মাছ আজো দিন-দুপুরেও চুরি হচ্ছে।

কাজেই একদিন রমলাবৌদি নিজেই পোষ্টমাষ্টারের স্ত্রীকে অনুনয় করে বললেন ওঁকে ওঁদের ঝি হিসাবে একটা ঠাঁই দিতে।

পোষ্টমাষ্টার গিন্নী বললেন, আচ্ছা কাল আসিস্, বাবুকে জিজ্ঞেস করে তবে বলব।

বৌদি আর্তনাদ করে বললেন, জান ঠাকুরপো, এই ঝি-গিরির জন্য বলতে আমার বুক ফেটে গেছে সেদিন। আগের দিন সারারাত আওড়েছি, কি বলব, কেমন করে বলবো। তবুও মুখস্থ হয়নি। কোন রকমে কথা কটি বলতে পেরে আমি আনন্দে এমন আত্মহারা

হয়েছিলাম যে, সেদিন রাস্তায় এসে দেখি আমার চোখের কোনে বেশ খানিকটা জল।

পরদিন বৌদি যাবার সঙ্গে সঙ্গে পোষ্টমাষ্টার জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভদ্রঘরের মেয়ে বলে তোমাকে মনে হচ্ছে, ঝি-গিরির কাজ কি পারবে?

বৌদি প্রত্যয় সহকারে বলছেন, পারবো বাবু। দেখুন না, কিছুদিন কাজকর্ম করিয়ে।

পোষ্টমাষ্টারের ঘরে সেদিন থেকেই রমলাবৌদি ঝি। কাজ নির্দিষ্ট হলো থালাবাসন মাজা, মাঝে মাঝে রান্না করা, কিছু কিছু কাপড় কাচা, আর ওঁদের ছ'সাত বছরের মেয়ে, যার নাম মিনু, তার পরিচর্যা করা। এমন কিছুই নয়। পরমানন্দেই রমলাবৌদি ওঁদের সংসারে কিছুদিনের মধ্যেই একাত্মা হয়ে গেছেন।

মিনু এই দুঃখের কি বুঝবে ঠাকুরপো? হঠাৎ বৌদি একটা আচমকা প্রশ্ন করে বসলেন আমাকে।

আমিও হকচকিয়ে গেছি। শুধু যে মিনু অবুঝ তা তো নয়, আমিও যে ঠাকুরমা-চিন্তা নিয়ে এতক্ষণ অনেকখানি অবুঝ ছিলাম; অবশ্য এখনো যে বুঝেছি বা বুঝতে চাইছি তা নয়। কিন্তু কিন্তু ভাব কাটেনি। সেই মিনুর বয়স তাহলে এখন কত? যতই হোক, মেয়ে হয়ে মাকে এমন নির্মম একখানা চিঠি লেখা ওর উচিত হয়নি। লেখাপড়া শিখেছে, আই. এ. পাশ করেছে, অথচ এ সামান্য কাণ্ডজ্ঞানটুকুও এতবড়ো একটা মেয়ের হয়নি।

বললাম, বৌদি, মিনু না হয় অবুঝ, তোমার মেয়ের মতো ওকে ক্ষমা করে দাও। এত সব ওকে লিখে কি হবে?

তুমিও ভুল করলে ঠাকুরপো? একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন বৌদি, না, ওর মনে যখন প্রশ্ন জেগেছে তখন তার একটা মীমাংসা হয়ে যাওয়া উচিত। না হলে যে প্রতিদিনের গ্লানি নিয়ে জ্বলেপুড়ে মরবে।

বেশ, তাহলে এক কাজ কর। চিঠিতে এসব লেখার দরকার নেই। আমি একবার ওদের সঙ্গে দেখা করি। তারপর সব বুঝিয়ে গুছিয়ে

বললেই ঠিক হয়ে যাবে।

তুমি কি বলবে তাদের? সব গুছিয়ে শুনলেই না, গুছিয়ে বুঝিয়ে বলবে কি?…তুমি বোধ হয় বলবে, মিনু আমার মেয়ে নয়, ওকে লালনপালন করে ওর মাতৃত্ব পেয়েছি; তাই না?

তা তো নয় কি?

না ঠাকুরপো, না। পোষ্টমাষ্টার গিন্নী মারা গেছেন ঠিকই। আমি ওঁদের ওখানে চাকরী নেবার মাস ছয়েক পরে ছেলে হওয়ার সময় তিনি মারা যান। সন্তানটিও মৃত হয়েছিল। কিন্তু পোষ্টমাষ্টার এতে প্রায় পাগল হয়ে গেলেন। তাঁর অবস্থা দেখে আমি তো ভয়ে দুঃখে মরছি। একদিন সাহস করে ঐ সাত বছরের মেয়েটাকে তোমাদের পোষ্টমাষ্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে কোলে বসিয়ে দিলাম। এতে তাঁর সম্বিৎ যেন হঠাৎ ফিরে এলো। কিছুদিন যাবৎ ঠিকভাবেই চলেছে। কিছুদিন মানে প্রায় আটবছর। আর কোনও অঘটন ঘটেনি। আমার চাকরী বহাল তবিয়তে চলল ততদিন। তিনজনের একটি ছোট সংসার আমার সুখের বলে মনে হলো। ঝি-গিরি করেছি বটে কিন্তু একদিনও নিজেকে ঝি ভাববার ফুরসৎ পাইনি।

কিন্তু এমন সুখ আমার কপালে সইবে কোন দুঃখে। এক ফাগুনের আগুনে পুড়ে যেন ছাই হয়ে গেল। গ্রামে শিবরাত্রি 'উপলক্ষে বিরাট এক মেলা বসেছে। এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে নানারকম জিনিসপত্র ইত্যাদি এসে বিরাট এক শহরের রূপ যেন সেখানে। সকাল বিকাল লোকে লোকারণ্য। সাতদিনের এই মেলা। প্রতিরাতে এখানে যাত্রা, থিয়েটার, মেজিক। গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য লোকের যাতায়াত। গ্রামের সবাই প্রায় প্রতিদিনই এমেলায় একবার না একবার যাবেই। আপনাদের পোষ্টমাষ্টারও মিনুকে নিয়ে যেতো সে মেলায়। কিন্তু সেবার মেলা ভাঙবার দিন দুই আগে আমাকে বলল, মিনুকে নিয়ে রাতে মেজিক দেখতে যাবে। আমি বাধা দিইনি। তবে এতবড় সোমত্ত প্রায় পনের ষোল বছরের মেয়েকে নিয়ে রাত্রিবেলা মেলায় মেজিক দেখতে যাওয়টা আমার যেন কেমন লাগল। কিন্তু বাপ-মেয়েতে যাবে, কি আর এমন

আশঙ্কা এই ভেবে কিছু বলিনি। কোথাও যাত্রা থিয়েটার দেখতে গেলেও মা মিনুকে নিয়ে যাওয়া তাঁর চায়।

কিন্তু সেদিন রাত ১২।১২॥ টা নাগাদ এসে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, মিনু এসেছে ?

মিনু ? মিনুতো আপনার সঙ্গে—

তাতো জানি। কিন্তু মেজিক দেখতে দেখতে সে যে কোথায় গেল হঠাৎ—

আমার মনে সেই আশঙ্কাটা যেন আবার মাথাছাড়া দিয়ে উঠল। ওর কাছে একটা ছেলে দু'তিনখানা চিঠি গোপনে জানালায় দিয়ে যেত। আমি দেখেছি চিঠিগুলো। কিন্তু ওকে দিইনি কোনদিন। আমার ধারণা ও ওসব চিঠির কিছুই জানে না। আমিই প্রথম পেয়েছি এবং পেয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। ঐ চিঠির ছেলেগুলো কোন রকমে ভুলিয়ে টুলিয়ে কিছু করেনি তো ?

পোষ্টমাষ্টার বিড়বিড় করে ভাবছেন, মাঝখানে একবার বাইরে গিয়েছিল বটে, কিন্তু আমিও তো তাঁবুর বাইরে এসেছিলাম—আর একবার কি বাইরে গিয়েছিল ?—কি যে হলো ? মেজিক দেখতে দেখতে মাঝখানে মিনু আছে কি নেই খেয়ালই ছিল না বোধহয়।—তারপর মেজিক ভাঙলে দেখি মিনু—হঠাৎ দুহাত চোখমুখের উপর চাপা দিয়ে ঘাড় নীচু করে আপনাদের পোষ্টমাষ্টার মিনুমা আমার, মিনু—ইত্যাদি বলে চীৎকার করে উঠল। আমি তো ভয় পেয়ে গেছি। ভয় অকারণে পাইনি। মিনু, ও মিনু বলতে বলতে তখুনি বেরিয়ে গেলেন; সারারাত, পরের দিন হন্যে হয়ে খুঁজলেন, কিন্তু কোন হদিসই পেলেন না! খাওয়া দাওয়া নেই, এক রকম পাগলের মত হয়ে গেছেন তিনি। পাগলের মতো বলি কেন, সত্যিই বছর খানেক পাগলই ছিলেন। আমি তাঁর অবস্থা দেখে নিজের কপালকে অভিসম্পাত দিচ্ছি, আমার উপস্থিতিতে একেবারে ছাড়খার হয়ে গেছে, আবার আর একটা ছাড়খার হতে চলল। সব আমার পোড়াকপালের দোষ ছাড়া আর কি ?

পোষ্টাফিসের কর্মচারীরা রমলাবৌদিকে পরামর্শ দিল, তাঁকে দুরের কোন শহরে নিয়ে যেতে, ভাল ডাক্তারের সাহায্যে চিকিৎসা করাতে। সমুদ্রের ধারে বা পাহাড়ী জায়গায় বায়ু পরিবর্তনের ব্যবস্থা না হলে তাঁর পক্ষে ভাল হওয়া শক্ত। বিশেষ করে ঐ গ্রামে থাকলে তো ভাল হবেনই না।

টাকা পয়সার ব্যাপারেও পরামর্শ দিল যে, ওঁর পোষ্টাফিসের খাতায় যে টাকা আছে আপাতত তাই তুলে নিয়ে যেতে। ওরা একটা ভরসা দিয়ে বলল, যাহোক করে পোষ্টমাষ্টারের একটা সই করিয়ে দিতে। ররলাবৌদি ওদের পরামর্শই গ্রহণ করল। পোষ্টমাষ্টারকে সঙ্গে নিয়ে কোলকাতার এক ডাক্তারকে দেখিয়ে একেবারে সোজা পুরী চলে এলেন। রমলাবৌদি খেতে বললে খান, ঘুমুতে বললে ঘুমোন, এই রকম তাঁর অবস্থা। দুঃখে যেন হতবাক। তিনি যেন বুঝে নিয়েছেন, এ পৃথিবীতে তাঁর কিছু করবার নেই শুধু অসহায়ভাবে দিন কাটানো ছাড়া।

জানো ঠাকুরপো, রমলাবৌদি বলে চলেছেন, এই পুরী এসে কিন্তু আমি আর ঝি রইলাম না। একজন ভদ্রলোক রোজ ঝিয়ের সঙ্গে সমুদ্রের পাড়ে ঘোরে, মন্দিরে যায়, এটা দেখতে কেমন কেমন। পাঁচটা লোক তাঁর সম্বন্ধে কি ভাবে বলত? তোমরা হয়ত বলবে আমি অবস্থার সুযোগ নিয়েছি। বললেও বলতে পার। তবে একথা ঠিক যে এই পুরীতে এসে আমি তাঁর উপর অসাধারণ কর্তৃত্ব প্রয়োগের অধিকারী হয়ে গিয়েছিলাম। কর্তৃত্ব বজায় রাখবার লোভ ক্রমশ যে আমার মধ্যে ঢুকে পড়েছে তাও বুঝতে পারছিলাম। ফলও হলো তদনুযায়ী। মানে—

কথাটা আধখানা শেষ করেই চুপ করে রইলেন তিনি। বোধ হয় ফলটা সঠিক কি বলতে তাঁর সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল।

আমার মাথায় সেই প্রাথমিক আশঙ্কাটা আবার দেখা দিল। রমলাবৌদির মেয়ে—যার চিঠিতে ওর মা সম্পর্কে অনেক অভিযোগ, তার বয়স কত? মিনুরও অভিযোগ যেন আমার আশঙ্কার সাক্ষ্য

দিচ্ছে। তারপর রমলাবৌদির কথাতে এখন কিন্তু কিন্তু ভাব। আমার চোখমুখে আমার আশঙ্কার সমর্থনে উত্তর পাওয়ার প্রশ্ন যেন ইতিমধ্যে আঁকা হয়ে গেছে। যে কেউ বুঝতে পারবে এখন আমার আশঙ্কা কি? আমার প্রশ্ন কি? রমলাবৌদিও তা বুঝতে পেরেছেন বৈকি।

রমলাবৌদির চোখের জল কপাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল; বললেন, ঠাকুরপো, সেই মিনু কি করে বুঝবে এসব কথা?

ছোট মিনুকে নিয়ে দু'বছর কেটেছে পুরীতে। মিনু বড় হতে লাগল, কথা বলতে শিখলো; মা বাবা ডাকতে শিখলো আর শিখলো আপনাদের পোষ্টমাষ্টারকে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলাতে। তিনি এবারও মিনু-অন্ত প্রাণ।

পোষ্টমাষ্টার স্বাভাবিক হয়েছেন বুঝতে পেরে সরকারের কাছে লেখালেখি করে শেষ বয়সে এসেছিলেন আমাদের এই ছোট্ট শহরে। এখানেই কাটিয়ে দিলেন শেষ জীবনটা। এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এসব কথাতো এখানকার প্রায় সকলেই জানেন।

রমলাবৌদি বললেন, মা হবার সৌভাগ্য তো শুরুতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যটা এমন দুর্ভাগ্যের মুখোস পরে কেন যে এলো! এর জন্য কখনো ভগবানকে ধন্যবাদ দিই, কখনো অভিসম্পাত দিই—যদিও মিনুকে সামনে দেখলেই আমার সব বোধ পাল্টে যায়—শুধু একটি কথা মনে থাকে যে, মিনু আমার মেয়ে, আপনাদের পোষ্টমাষ্টারের আদুরে মেয়ে। আমি যে ওর মা—

ঠিকই তো। ঠাকুরমা হঠাৎ অলক্ষ্যে পালিয়ে গেলেন যেন। অত শত ভাববার দরকার কি? সত্যি কথাটা সত্যি বলে সমাজ গ্রহণ করতে না পারলে সমাজের কৌলিন্যে আঘাত লাগে তো লাগুক। সমাজ-মনের জট ছিঁড়তে না পারলে যে সমাজকে খুনীর অপরাধে অপরাধী হতে হবে! সেটা তো সুস্থ সমাজ-নেতৃত্ব চায় না। তবে রমলাবৌদির বিবর্ণ ভাব কেন? মিনুরই বা কিসের অতসব বাজে কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি?

রমলাবৌদিকে বললাম, ঠিক হয়ে যাবে সব। তুমি একটুও দুঃখ করো না।

আশ্বাস যে শুধু রমলাবৌদিকে দিলাম তা নয়; নিজেও আশ্বস্ত হলাম। কর্তব্য আমার স্থির। রমলাবৌদিকে এখানে একা একা থাকতে হলে তাঁর মানসিক বিপর্যয় স্বাভাবিক। মিনুকে জরুরী টেলিগ্রাম করে রমলাবৌদির অসুখের কথা জানিয়ে মিনু ও মিনুর বরকে এখুনি আনানো দরকার। ওদের বোঝাতে হবে, টুকরো টুকরো ঘটনা—যা কোন স্বার্থসংলিষ্ট বা নিঃস্বার্থ বুদ্ধিহীন লোকের কাছে শুনেছে তা হয়ত সত্যি, কিন্তু তার চাইতেও সত্যি ঘটনা—যা একমাত্র বৌদি জানে—আর সম্ভবত আজ থেকে আমি জানলাম—তাও ওদের জানা উচিত—উদার মনে বোঝা উচিত। কতকগুলো ঠুনকো মর্যাদা বা আভিজাত্যবোধ নিয়ে মাকে অহেতুক অপরাধী ভেবে নিজের দৈনন্দিন জীবনকে গ্লানিময় করে তুলবার স্বার্থকতা কি?

টেলিগ্রাম পেয়ে মিনুরা আসতে দেরী করল না। খুব ভাল লক্ষণ। এতটুকু মমতাও তো আছে।

মিনুকে বললাম, তোমাদের সঙ্গে মাকে নিয়ে যাও, একা একা থাকে, মন খারাপ করে—তোমাদের কথা ভেবে ভেবে অসুখ হলে নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে থাকে। কখন কি হয় বলা তো যায় না—

আর সব কথাও দুজনকে খুলে বলতে দ্বিধা করিনি। দেখলাম, ওরাও রাজী। নতুন যুগের নতুন আলোকে ওরাও উদ্ভাসিত হতে অরাজী একথা আর সত্যের মর্যাদা পেলো না, সত্যিই ঠাকুর-মা চিন্তাধারার নব-মূল্যায়ন দরকার।

রমলাবৌদিও যেতে রাজী।

জানি না রমলাবৌদির বিবর্ণ রঙ কতকখানি আশ্বাসের রঙ ফিরে পেয়েছে। তবে আমার চিন্তাধারায় যে নতুন রঙ রমলাবৌদির কাছ থেকে আজ লাগলো, তা বোধ হয় আর কখনো ফিকে হবে না। মানুষকে মানুষ বলে ভালবাসতে জানার রঙ নিশ্চয় পাকা রঙ।

অমিতাভ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

অমিতাভ বললে, আবার আপনার কাছে আসতে হল দাদা।

অপরিসীম বিস্ময়ে আমি চোখ তুলে তাকালুম ওর দিকে। সেই এক মাথা রুক্ষ চুল—সেই বোতাম বর্জিত বুক খোলা গেরুয়া পাঞ্জাবী। অবশ্য পাঞ্জাবীতে এক সময় এক সেট সোনার বোতাম লাগান ছিল, পৈতের সময় পেয়েছিল অমিতাভ। সে বোতাম আপাততঃ নেই—কোথায় গেছে সে-ও আমার অজানা নয়।

জীর্ণ ফোলিও ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে অমিতাভ হাঁপাতে লাগল অল্প অল্প। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে, কপালে ঘাম। আমি বললুম, আবার পত্রিকা?

—হাঁ দাদা।

আমার রাগ হল। বললুম, এততেও শিক্ষা হল না তোমার?

সুন্দর পরিচ্ছন্ন দাঁতগুলো মেলে অমিতাভ হাসল। বললে, ফেলিওরস্ আর দি পিলারস্ অফ—

বিরক্তিভরে বললুম, থামো—থামো। আচ্ছা—কি লাভ হচ্ছে তোমার এ-সব করে? পর-পর তিনখানা কাগজ বের করলে—তিন মাসের বেশি একখানাও টেঁকাতে পারলে না। প্রথম কাগজে ছুটো আংটি গেল, ছু'নম্বরে গেল সোনার বোতাম, তিন নম্বরে বোধ হয় ঘড়ি আর ফাইন্টেন পেন গেছে। টিউশন করে কী পাও তা আমি জানি না। কিন্তু যে মেসে থাকো, দিনের বেলাতেই ধেড়ে ইঁছুরের ল্যাজ মাড়িয়ে ঢুকতে হয় তার ভেতর। এ পাগলামি এখন বন্ধ করো দিকি।

অমিতাভ বললে, দাদা, আপনি গল্প টল্প লেখেন। নিজেও বিলক্ষণ জানেন, একটা পাগলামো ছাড়া মানুষ থাকতে পারে না। আপনি

সভায় বক্তৃতা করতে যান—অথচ সে বক্তৃতা যে কারো ভালো লাগে না তা নিজেও বুঝতে পারেন। তবু বকুনির পাগলামো ছাড়তে পারেন কি? কেউ রেস খেলে, কেউ তাস নিয়ে খেপে, মোহনবাগান কিংবা ইস্টবেঙলের হারজিতে অনেকের মাথায় খুন চাপে। কারো কারো ধারণা, তার পাঁচ বছরের ছেলেটি যে মেধার পরিচয় দিচ্ছে এই বয়সেই, তাতে ভবিষ্যতে একটা প্রলয়ঙ্কর কিছু করে বসবে। পাগলামি কার নেই আপনি বলুন?

বললুম, বাজে যুক্তি দিয়ে আসল কথাটা চাপা দিতে পারবে না। সত্যি কেন করো এ-সব? নিজে যদি দু-এক লাইনও লিখতে, তবে বুঝতুম, আর কেউ লেখা ছাপেনা বলে রেগে কাগজ বের করছ। কিন্তু তাও তো নয়। কিছুই কখনো লেখোনি। কেবল অকারণ পুলকে—

—পুলক নয় দাদা।—অমিতাভ গম্ভীর হলো: একটা স্ট্যাণ্ডার্ড সাহিত্যের পত্রিকা বের করব। আবিষ্কার করব নতুন নতুন লেখক। এই হচ্ছে আমার আসল স্বপ্ন।

—তোমার স্বপ্নের পুরা ফল পাচ্ছে পাতিরাম।—আমাকে বস্তুতান্ত্রিকভাবে জানতে হল: পুরানো অচল পত্রিকা ওজন দরে বিক্রি করে দিয়ে ওর কত টাকা লাভ হয়—তা জান? সেদিন ফুলুরী আনিয়েছিলুম তেলেভাজার দোকান থেকে। দেখলুম, সেটা তোমারই 'উত্তিষ্ঠত:' পত্রিকার পাতায় মোড়া—আর তেলে চুপ্‌সে যাওয়া কাগজে দেখলুম পাইকা টাইপে লেখা রয়েছে—আমাদের এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ কখনোই থামবে না—আমরা এগিয়ে চলব: চরৈবেতি। ইত্যাদি।

ছায়া নামল অমিতাভের মুখে। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য।

—কিন্তু এবার একজন ভালো ফিনান্‌শিয়ার পাচ্ছি।

—ও:!

—এক বছরের বাঁধা বিজ্ঞাপনও জোগাড় হয়ে যাবে—আশা আছে।

—থাক, থাক, আর বলতে হবে না। তুমি যা যা বলবে সব আমার মুখস্থ আছে। এর পরে বলবে, এমন একটি প্রেস পেয়েছ যে তোমাকে সবদিক থেকে সাহায্য করতে রাজী হয়েছে। মফঃস্বলে এমন এজেন্টের সন্ধান মিলেছে যারা পঞ্চাশ ষাট কপি চালিয়ে দেবে। এই তো? না—আরো কিছু আছে?

অমিতাভ আবার ম্লান হল।

—আপনি ঠাট্টা করছেন? কিন্তু আমারও অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। এবার আমি আটঘাট বেঁধেই নামছি।

—হুঁ।

—দেখবেন, দাঁড় করিয়ে দেব।

—সাধু। তা কাগজের নাম কি দিচ্ছ?

—নামটা বেশ ভালো হয়েছে দাদা, 'অনির্বাণ'।

—নিবছে কবে?

—সহজে নয়।—অমিতাভকে এবার অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মনে হল: চারদিক বেশ ভালো করে দেখে শুনেই নামছি এবার। দিন একটা আশীর্বাণী লিখে।

দিলুম। লিখলুম, 'এই পত্রিকার অনির্বাণ শিখা জ্বলতে থাকুক বাণীর দেউলে, তরুণ সাধকেরা সেই শিখার পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে দেবীর আরতি করতে থাকুক'—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

খুশি হয়ে উঠে পড়ল।

—আসি আজ। কাগজ বেরুলেই নিয়ে আসব এখন।

চলে গেল। আমি বসে বসে ওর কথাই ভাবতে লাগলাম। ওর এই কাগজ বের করবার নেশা রেসের নেশার চাইতেও মারাত্মক। দুঃখের দাম অনেক দিয়েছে, কিন্তু কিছুতেই নিজেকে শোধরাতে পারল না।

একটা সান্ত্বনা ওর নিশ্চয় আছে। ওর তিনটি পত্রিকায় দু'জন কবি আর একজন গল্প লেখকের প্রথম রচনা ছাপা হয়েছিল। তারা বেশ নাম করেছে এখন। অবশ্য আজ তাদেরি কাছে অমিতাভ লেখা

চাইতে গেলে বিনা টাকায় তারা লিখতে রাজী হবে না। সেজন্যে কোন ক্ষোভ নেই অমিতাভের। আবার নতুন লেখক আবিষ্কার করে নেবে।

দিন কয়েক পরে এল অমিতাভ। হাতে 'অনির্বাণ'।

উলটে পালটে বললুম, বেশ হয়েছে তো।

—হ্যাঁ সবাই তাই বলছে। কয়েকটা নতুন ফিচারও দিয়েছি—লক্ষ্য করেছেন ?

—করেছি। কিন্তু সাড়া পাচ্ছ কেমন ?

—খুব ভালো। পাতিরাম বলছে—

—সে তো প্রত্যেকবারই বলে। কিন্তু তোমার কাগজ দাঁড়ায় না।

—দাঁড়াবে দাদা, এবার নির্ঘাৎ দাঁড়াবে। নিজে কড়া নজর রাখছি—আর সমানে খাটছি। এই দেখুন না—বেলা ছুটো বাজে—স্টলে স্টলে কাগজ ডেলিভারী দিয়ে চান-খাওয়ার সময়ই পেলুম না এখনো। আচ্ছা, চলি আজ। দেখে রাখবেন কাগজটা—পরে মতামত নেব।

দেড়মাস পরে দ্বিতীয় সংখ্যা এল। অমিতাভ নিজে আনল না—একটা ছেলে দিয়ে গেল। আরো ছু'মাস পরে তৃতীয় এবং চতুর্থ যুগ্ম-সংখ্যা এল পিয়নের হাতে।

যুগ্ম-সংখ্যার অর্থ আমার অজানা নয়। আমি বিষণ্ণ হাসি হাসলুম। তার মানে, অনির্বাণও নিভল। এ যাত্রাও অমিতাভ কাগজ টিকিয়ে রাখতে পারল না।

মাস চারেক দেখা নেই। তারপর হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল, বৌবাজারের একটা গলি দিয়ে দ্রুত চলেছে অমিতাভ। বগলে সেই ফোলিও ব্যাগ।

—ওহে, শোনো, শোনো।

অমিতাভ তাকিয়ে দেখল একবার।

—এখন না সুকুমারদা, পরে। একটু ব্যস্ত আছি।

—আরে শোনই না—

অগত্যা দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কাগজ বার করবার নেশা কাটল?

হাসলে অপ্রতিভ ভাবে, জবাব দিল না।

—আর কতদিন এমন ভাবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে?

না দাদা, এবার কাগজটা নষ্ট হত না। এমন কতগুলো ক্যালকুলেশনে ভুল হয়ে গেল—

অমিতাভ শেষ করতে পারল না। আর সেই মুহূর্তে আমি বুঝলুম, ওকে ডেকে দাঁড় করিয়ে কত বড় অন্যায় করেছি আমি।

গুণ্ডা চেহারার দুটি লোক এসে দু'দিক থেকে ধরেছে ওকে। কর্কশ গলায় একজন বললে, প্রেসের বিল?

অমিতাভের মুখ ছাইয়ের মত হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

—বলেছি তো, মাস খানেকের ভেতর—

—মাস খানেক! সে মাস খানেক আর কোনোদিন আসবে না! টাকা তো পাবই না, বরং হাতের সুখ করে নিই একটু।

আমি ভালো করে বোঝবার আগেই দু'দিক থেকেই কিল-চড় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। মাত্র মিনিট খানিক। তারপরেই পাশের একটা সরু গলি দিয়ে সরে পড়ল লোক দুটো। ওস্তাদ গুণ্ডা।

অমিতাভকে টেনে তুললুম মাটি থেকে।

জামা ছেঁড়া, দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ছে। ব্যাগটা গিয়ে পড়েছে ডাষ্টবিনের ভেতর। পকেটের কাগজ-পত্র রাস্তায় একাকার। মুহূর্তে যেন প্রলয় হয়ে গেছে।

আমার কিছু বলবার দরকার ছিল না। কোঁচার খুঁটে মুখের রক্ত মুছতে মুছতে অমিতাভ নিজেই অস্পষ্ট গলায় বললে, না দাদা, আর আমি কাগজ বের করব না—আর নয়।

আবার চার মাস পরে।

—আসতে পারি?

দেখি দোর গোড়ায় অমিতাভ। সেই বুক খোলা পাঞ্জাবি—সেই বিবর্ণ ফোলিও ব্যাগ। আর মুখে সেই সুন্দর দাঁতের আশ্চর্য উজ্জ্বল হাসিটা।

—আবার আপনাকে বিরক্ত করতে এলুম। আর একটা আশীর্বাণী চাই।

জনৈক

আশা দেবী

বাইরের বেঞ্চিটায় বসে বসে নিশিকান্ত ভাবতে লাগলো ছোট কাকার কথা। তার সঙ্গে যেন ইনটারভিউ বোর্ডের কার কার সঙ্গে জানা আছে। অবশ্য দেখাও করেছে ও অনেকেরই সঙ্গে। পকেট থেকে একটা দীর্ঘ নামের ফর্দ বের করলো নিশিকান্ত। তাতে ইনটারভিউ বোর্ডে যারা আছেন সকলেরই নাম এবং ঠিকানা তরিবৎ করে লেখা কোথাও কোথাও নামের পাশে নোটও দেওয়া আছে। কোথায় কী ভাবে কাকে পাওয়া যাবে এবং ধরা যাবে। কার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে কার কাছে যাওয়া যেতে পারে। নিশিকান্ত দেখলে প্রায় সবাইকেই ধরা হয়ে গেছে। বড়দার প্রভাব প্রতিপত্তি খুব বেশী, তিনিই চেষ্টা এবং ছোট ভাইয়ের চাকরীর জন্যে একটু বেশী রকমের তৎপর হয়েছেন। অবশ্য এ ধরাধরির জন্যে বড়দার খুবই অসুবিধা হচ্ছে —বাড়ীতে দুটো গাড়ী আছে কিন্তু একটার ড্রাইভার এ সময় মেয়ের অসুখ বলে ছুটি নিয়ে গেছে—। ফুঁ! নিশিকান্তর মুখ দিয়ে একটা বিরক্তি সূচক আওয়াজ বেরিয়ে এলো—মেয়ে অসুখ করবার আর সময় পেল না। অবশ্য আর একটা গাড়ী বড়দা নিজেই চালায় কিন্তু তাতে অসুবিধা কত। বড়দা গাড়ী নিয়ে বেরুলেই নিশিকান্তকে হয় ট্রামে-বাসে, নয় ট্র্যাক্সি করে যেতে হয়। আর ট্যাক্সিতে না নিয়েই বা কি করবে—ট্রামে বাসে কখনও কোন ভদ্রলোক যেতে পারে, জামা কাপড়ের ক্রিজ নষ্ট হয়ে যায় লোকের ময়লা হাত গায়ে লাগে, আর ঘাম লেগে যায়—সে ভারী বিশ্রী। নিশিকান্ত উঠে দাঁড়ালো বেঞ্চি থেকে। দামী প্যান্টের ভাঁজ-টাজ গুলো একবার পরীক্ষা করে নিলো—, টাইটার নট ঠিক আছে কিনা একবার বেশ করে দেখে আবার বেঞ্চিটার ওপরে বসলো।

কত লোককে ইনটারভিউ এর জন্যে ডেকেছে কে জানে, হয়তো দশ জন, হয়তো পনেরো। ভারি তো একটা ক্লার্কের চাকরী। নিশিকান্ত ভুরু কোঁচকালো। বড়দা বলেছিল: যা নিশিকান্ত, একটু কাজে কর্মে মন দে। সারাদিন তাস খেলবি আর গল্প করবি—; তবুও কর একটা কাজ, ড্রাইভারের মাইনেটাও তো ঘরে আসবে। আর তোকে বলতাম না কাজ করতে, ঘরে বসে বসে মোটা হয়ে যাচ্ছিস—, তা ছাড়া ওখানকার বড়বাবু আমার বন্ধু—তুই যে চাকরী করছিস তো একবারও মনে হবে না।

নিশিকান্ত পকেট থেকে এক তাড়া চিঠি বের করে পড়তে লাগলো। কোনটা অনুরোধ করে বড়বাবুকে লেখা—, কোনটা বা ম্যানেজিং ডাইরেক্টারকে ঘায়েল করবার জন্যে কোন রাঘব বোয়ালের পত্র— কোনটা বা নাম-জাদা লোকের নানা ভাষায় নিশিকান্তের গুণাবলীর ব্যাখ্যান।

একটা হাল্কা জুতোর শব্দ শুনে ধড়মড় করে পকেটে কাগজগুলো গুঁজে ফেললো নিশিকান্ত। নিশ্চয়ই তার প্রতিদ্বন্দ্বী।

একটি রোগা মত ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলো। পরনে আধময়লা কাপড়—জামায় রিপু করা, মাথার চুলে তেল নেই, পায়ে ছেঁড়া চটি। ধপ করে নিশিকান্তের পাশে বসে লোকটা হাঁপাতে লাগলো।

: যা ছুটে এসেছি কি বলবো, ভাবলাম ঠিক সময়ে পৌঁছুতেই পারবো না—যাক্ এসে তো পড়েছি—কটা বাজল স্যার—

নিশিকান্ত রোলেক্স ঘড়িটার দিকে তাকালো—সাড়ে চারটে। এখনও আধ ঘন্টা বাকী আছে।

: পাঁচটায় তো আরম্ভ—তা আধঘন্টা বিশ্রাম করা যাবে। —একটু দম নিয়ে লোকটা বললে, মশায়ের নাম? —বলেই ঠোঁট ছুটো ফাঁক করে নিকেলের চশমাটার উপর দিয়ে কোটরগত চোখ ছুটো মেলে ধরলো।

: নিশিকান্ত রায়—

: ও—থাকা হয় কোথায়?—আবার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

: কাছেই— ; সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল নিশিকান্তের—কাজেই জবাবও সংক্ষিপ্ত হলো।

: ছেলে পিলে কী? —বলেই লোকটা নাক কুঁচকে আবার তাকালো।

: বিয়ে করিনি— ; বলেই ঘুরে বসলো নিশিকান্ত। এ ধরণের বাজে কথা বলতে সে মোটেই ভালবাসে না। —আর অমনি ময়লা কাপড় আর কেড্‌স্ পরা লোকটার অহেতুক কৌতূহল ও বিরক্তিই বোধ হতে লাগলো। এবার লোকটা কিন্তু প্রশ্ন না করে নিজেই বলে যেতে লাগলো। বলবো কী মশাই—আমার সাতটি মেয়ে—

: তা বেশ—নিশিকান্ত এবার ঘুরে বসলো।

: তা বেশ বলেছেন—? তা আপনি ব্যাচেলার লোক—বলতে পারেন বৈ কি। কিন্তু আমি তো মরি এ দুর্দিনের বাজারে। আমার বাড়ী পাকিস্তানে—সব ফেলে এসেছি এক কাপড়ে—সাত মেয়ের হাত ধরে—গিন্নী অবিশ্যি খুব ভাললোক। আসবার সময় খুব কেঁদেছিল।—

: সাত মেয়ের হাত ধরে এলেন পেছনে স্ত্রী—মানে শোভাযাত্রা করে এলেন বলুন।

: ঠাট্টা করছেন? বাড়ী ছেড়ে আসতে কল্‌জে ফেটে গেল—ছাত্র পড়াতাম—বাড়ীতেই স্কুল ছিল। কত কাঁদলো ছেলের—কিন্তু কী করবো বলুন, উপায় নেই। রহিমটাকে কত মারতাম আসবার সময় পা জড়িয়ে ধরে বললে: মাস্টার সাহেব—কসুর মাফ করবেন—এমন যে, বলতে বলতে ভদ্রলোক নিকেলের চশমা খুলে চোখ মুছলে— ; মাঝে মাঝে যখন চাকরীর জন্যে দরজায় দরজায় ঘুরি মনে হয় রহিমের কথা। বলতো মাস্টার সাহেব, আমাদের গ্রামে বাবাকে বলে আমি পাঠশালা দেওয়াব—আপনি হবেন হেড মাস্টার—আপনার আর কি কষ্ট হবে?

: বেশ তো লেখাপড়া জানেন—তবে এ চাকরী করতে এলেন কেন?

: কেন এলাম ?—তু' বেলা টিউশন করি—ছেলে পড়াই, মাস্টারী করবার ঝোঁক তো ছাড়তে পারি না। কিন্তু তাতে কী সংসার চলে ? বস্তিতে থাকি একটা ঘরে। বড় মেয়েটা বিধবা—মেজটার বিয়ে দিয়েছি—এখনও পাঁচটি বাকী। তাদের স্কুলের খরচ—জামা কাপড়—

: উঃ তবে তো বিরাট খরচের মধ্যে পড়েছেন—নিশিকান্ত বললে : একটা মোটা মাইনের চাকরী না পেলে আপনার চলবে কী করে ; দে—খি—আমি যদি কিছু—

: করবেন চেষ্টা ? সত্যি বলছেন ? —বুড়ো লাফিয়ে উঠলো : জানেন—বড় বিধবা মেয়েটা পালিয়েছে এক দোকানওয়ালার সঙ্গে— ; তার জন্যে কাঁদবো কী—তার দস্যির মত বৌটা সব সময় গালাগালি দিচ্ছে। গিন্নী বড় ভালো মানুষ আর সহ্য করতে পারে না। সব সময় আমাকে বলে : আমায় বিষ এনে দাও—ভদ্রলোকের মেয়ে এমন হয় ? কি যে বিপদে আছি কী বলবো। আপনি আমার যে উপকার করলেন কী বলবো।

: উপকার আর করলাম কই—নিশিকান্ত পকেট থেকে গোল্ডফ্ল্যাকের টিন বের করলো।

মাস্টার নিশিকান্তকে বললেন, আপনি স্যার কেন এসেছেন এই কাজের ইণ্টারভিউ দিতে ? এসব কি আপনার মানায় ?

: না—মানে নিশিকান্ত বললে, মানায় না। দাদা বললে ড্রাইভারের মাইনেটা তো হবে।

: ও তাই বলুন। এতক্ষণে আমি একটু নিশ্চিন্ত হলাম। বাইরে গাড়ী—ও ওটা আপনারই ? অমন দামী পোষাক—দেখেই বুঝেছি এসব কাজ—

কত সহজে এসব কথা বিশ্বাস করলো বৃদ্ধ। শহরে এসেছে তবু গ্রামের সরলতা এখনও মুছে যায়নি মন থেকে। —এখনও বিশ্বাস করতে জানে—এখনও সরলভাবে মানুষকে ভালবাসে।

সামনে দিয়ে বড়বাবুরা জুতো মস্‌মস্‌ করে চলে গেলেন ঘরের মধ্যে ; পেছনে ফাইল নিয়ে বেয়ারা—আরো তু'চারজন লোক গেল।

আরো এসেছে দুজন তারাও বসে আছে। কিন্তু নীরব হয়ে। এ পর্যন্ত বহু ইন্টারভিউ তারা দিয়েছে এবং জ্ঞানবৃক্ষের অনেক ফল খেয়েছে বলেই মনে হলো। বুড়ো শুধু এক একবার তাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। তারা কোন কথার জবাব দিলো না।

বৃদ্ধ যেন কি একটা লাভ করেছে এমনিতর ভাবে বারকতক ঘোরা ফেরা করতে লাগলো। তারপর নিশিকান্তের কাছে আবার এসে বসলো—এখুনি তো ইন্টারভিউ সুরু হবে—তারপর যে যার ঘরে ফিরে যাবে—আর কখনও দেখাও তো হবে না। আপনি আমার এতখানি বন্ধু এত বড় উপকার করবার কথা বললেন—একটা ঠিকানা দিন—। আপনি বলুন আমি লিখে নিচ্ছি।

নিশিকান্ত ঠিকানা দিলো। কিন্তু একটু পরেই ইন্টারভিউ সুরু হলো। প্রথমে আগের ভদ্রলোক দুটি এবং পরে নিশিকান্তের ডাক এলো। বৃদ্ধের পরেই নিশিকান্তের ডাক এসেছিল।

বেরিয়ে এসে নিশিকান্ত বললে: আপনাকে কী জিজ্ঞাসা করলো?

: কি আর করবে। ভারি ময়লা কাপড় চোপড়—আর ছেঁড়া জুতোর দিকে তাকিয়ে বললে: এ ভাবে ইন্টারভিউ দিতে হয়? এত ময়লা কাপড় চোপড়।

: ঠিক, বলবেনই তো—; নিশিকান্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করলো।

: আমি বললাম; স্যার বাড়ীতে ৭।৮ জন খাইয়ে, রোজগার কিছুই নয়, বিক্রি করতে করতে গিন্নীর হাতে লোহাগাছা আর মাটির বাসন-কোসন সম্বল। বাড়ী বিক্রী করে যা পেয়েছিলাম সব 'পেটায় নমঃ—কাপড় চোপড় কোথায় পাব। আমাকে চাকরী না দিয়ে স্যার এই নিশিকান্তবাবুকেই চাকরীটা দেবেন—যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য তেমন চকচকে পোষাক—আর মনটাও তেমনি দরাজ। আমাকে অন্য একটা কিছু উনি জুটিয়ে দেবেন।

ম্যানেজার হেসে বললে: বলেছে বুঝি? তবে নিজে কেন এলো ইন্টারভিউ দিতে, চলে গেলেই পারতো—

: ও আচ্ছা আসি—সমস্ত মুখখানা কালো হয়ে গেল নিশিকান্তের

—ছটফট করে পালিয়ে গেল।

বুড়োর এবার যাবার পালা। কিন্তু হঠাৎ দেখলে, যে বেঞ্চির ওপর নিশিকান্ত বসেছিল সেই বেঞ্চির তলায় একটা মানিব্যাগ পড়ে—তাতে আড়াইশোর মত টাকা আছে—নিশ্চয়ই এটা নিশিকান্তেরই হবে,—বুড়ো চট করে পকেট থেকে ঠিকানাটা বের করে দেখলো তারপর সামনের চলন্ত বাসে ওঠে পড়লো।

হ্যাঁ এই তো ঠিকানা বকুল বাগানের মোড় ঠিক তো নম্বর—মিলছে; কিন্তু কড়া নেড়ে জানলে ও নামে কেউ এ বাড়ীতে থাকে না। ভুল নম্বর।

টাকাটা নিয়ে পরদিন বৃদ্ধ আবার অফিসে আসতেই বড়বাবুর সঙ্গে দেখা—

: কি হে নীরদবাবু—তাহলে চাকরীটার—

: না—না সেজন্তে আসিনি। নিশিকান্তবাবুর ম্যানিব্যাগটা ও ফেলে গেছে—ওকে যদি দেবার ব্যবস্থা করেন।

: ওটা আমারই—আর শুনুন যাবার সময় আপনার এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা হাতে হাতেই নিয়ে যাবেন।

নীরদবাবু এবার কেঁদে ফেললো—অনেক দিন পর সে কাঁদলো। এমন করে বহুদিন সে কাঁদেনি। টাকার ব্যাগটা টেবিলে রাখতে ম্যানেজারবাবু বললেন: দরকার থাকে তো কিছু এ্যাডভান্স নিতে পারেন—

ততক্ষণে নীরোদবাবু বাসের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সেই এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটাই দেখছিল; বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারছিল না—এটা তারই। কিম্বা কি মনে করছিল নিশিকান্ত তাকে এর চেয়ে ভাল একটা চাকরী দেবে বলেছিল সুতরাং এটা ওর হলেই ভাল হোতো। কিম্বা এরা এমনি করেই চিরকাল ভাবে এবং ঠকে কিম্বা এ সব কিছুই এদের স্পর্শ করে না দুঃখ সইতে সইতে সওয়াটাই এদের অভ্যাস।

এক অপদার্থের গল্প

নিতাই পোদ্দার

অগত্যা অন্ধকার ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে বিড়ি ধরায় কমলেশ। কানটাকে সজাগ রেখে কিছু একটা শুনবার চেষ্টা করে। ওঘর থেকে কড়াইয়ে খুন্তি নাড়ার শব্দ আসছে। ভীষণ রাগ হয় সুলতার 'পর। এবং বুঝতে পারে ক্রমশ মন তার বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে—সে অধৈর্য্য হয়ে পড়ছে।

লণ্ঠন হাতে ব্যস্ত ভাবে ঘরে ঢোকে সুলতা। কমলেশ লক্ষ্য করে, লণ্ঠনের কাঁচটা বিশ্রী ভাবে কেটে গিয়েছে, শিষ উঠে সারাটা চিমনি কালিতে ছেয়ে গেছে। ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

—একি! এমন সময় শুয়ে আছে!

বিরক্তি ভরা মন বিচলিত হয়ে ওঠে, রাগে চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হলো কমলেশের। কিন্তু কি মনে হওয়ায় হঠাৎই বোধ করে এভাবে সুলতার 'পর রাগ করার কোন মানে হয় না, অক্ষমতা তার নিজের।

—উপায় কি।

কমলেশ উঠে বসতে বসতে সুলতার মুখের দিকে তাকায়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে, সুলতা কত তাড়াতাড়ি বুড়ী হয়ে যাচ্ছে। চোখের কোণে কালি, মুখের ভাঁজেও যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। সত্যি, বেচারা! কমলেশ মমতা বোধ করে, বিষণ্ণ হেসে বলে, রান্নাটা সন্ধ্যের আগে সেরে রেখো। আলোটা থাকলে এসময় খুকুকেও পড়াতে পারি আর আমার লেখার কাজ টাও চলে।

সুলতা কাছে এসে দাঁড়ায়। কমলেশের মাথার চুলে ডান হাতের আঙুলগুলো দিয়ে বিলি কাটে। ঘন, মোটা চুল। তেলাভাবে জট পাকানো। ততক্ষণে সুলতা মনে মনে কথাগুলো ভেবে সাজিয়ে নেয়।

তারপর হাল্কা করে হেসে নরম আদুরে গলায় বলে, ও বাড়ীর গিন্নীমার সেই উলের ব্লাউজটা, সে'টা শেষ করতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। আজকেই আবার দেবার কথা ছিল।

কমলেশ মুখখানা গম্ভীর করে, চোখ তুলে একপলক তাকায় সুলতার দিকে। গলাটাকে যথাসম্ভব ভারী করে বলে, পারিশ্রমিক কত? কমলেশ ইচ্ছে করেই 'মজুরীর' বদলে 'পারিশ্রমিক' কথাটা ব্যবহার করে।

সুলতা সরে এসে আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়। ঘাড়টাকে একটু বেঁকিয়ে, মুখখানা কাচুমাচু করে, গলার স্বরটা খাদে নামিয়ে বলে, অন্যে হলে চার টাকাই নিতাম। বাড়ীর পাশে বাড়ী, গিন্নীমা আমায় ভালও বাসেন খুব। দু'টো টাকা হাতে দিয়ে বললেন, বড় খোকার একটা জাম্পার করাব তখন পুরো চার টাকাই দেবো। যাই, ভাতটা নামিয়েই চলে আসবো।

কমলেশকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেল সুলতা।

আবার অন্ধকার। আর অন্ধকার ঘরের নির্জনতায় কমলেশ নিজেকে বড় অসহায়, দুর্বল মনে করলো, দীর্ঘশ্বাস ফেললো। পকেটে হাত ঢুকালো না, একটাও নেই। দিনের বরাদ্দ বারো পয়সার বিড়ি শেষ হয়ে গেছে। নেশাটা চাড়া দিয়ে ওঠে কমলেশের, বিরক্ত বোধ করে। ধুৎ, শালার নেশাটা এবার ছেড়ে দেবো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে কমলেশ ক্লান্ত মনে শুয়ে পড়ে।

ভাবতে চেষ্টা করল, খোলা জানালা দিয়ে বাইরে আকাশের দিকে চোখ পড়ে, ভীষণ অন্ধকার বোধ হলো নিশ্চয়ই অমাবস্যা তিথি। গাঢ় কালো আকাশটায় জ্বল জ্বল করছে লক্ষ লক্ষ তারার জোনাকি ঝি ঝি ডাকছে, একটানা, একঘেয়ে।

কমলেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো। বাষট্টি টাকায় আর চারটি প্রাণীর টিকে থাকা সম্ভব নয়। সারাজীবন টাকা টাকা করেই কাটাতে হবে। বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। ঘেমে উঠলো কমলেশ। আধ-পেটা খেয়ে [তবু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুষ্ঠু রেশনিং ব্যবস্থায়] ঘর-

ভাড়া দিয়ে, মুদির ধার মিটিয়ে, এ হাতে আনতে ও হাত খালি। —ছেলেটা মানুষ হলো না। অন্তত মানুষ করে গড়ে তোলার মত কোন দায়িত্ব, কর্তব্য পালন করেনি কমলেশ। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করে উঠলো, নিজেকে একটা আস্ত অপদার্থ মনে হলো। ব্যথায় মুসড়ে উঠলো মনটা।

স্বলতা এসে ঘরে ঢোকে। পেছনে পেছনে বছর আটেকের মেয়ে খুকু। ময়লা একটা জামা গায়, সামনের দিকে বেশ খানিকটা ফাঁসানো। লণ্ঠন নামিয়ে রাখতে রাখতে স্বলতা বলল, বই নিয়ে পড়তে বস খুকু।

কমলেশ কোন কথা না বলে উঠে বসে, মাদুরটা বিছিয়ে নেয়। তারপর গল্পটা শেষ করার জন্য—তৎপর হয়ে ওঠে।

—নতুন আর একটা লিখছ ?

—হ্যাঁ।

—আগেরটার দরুণ টাকা দিয়েছিল ?

—দশ টাকা। নতুন লেখক, তাছাড়া বাংলাদেশে ভুঁই ফোড় কাগজেরও অভাব নেই, লেখকেরও।

—মাথার পরিশ্রমের মজুরীও হয় না।

—ভাষাটা একটু সংশোধন করো, বলো, সম্মান মূল্য। গলাটা গম্ভীর করে বলল, একটা উলের ব্লাউজের চেয়ে ভাল। স্বলতার দিকে সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকাল।

—তুমি ঠাট্টা করছ ?

—না। আমরা যে গরীব।

দুজনের মুখেই হাসি দেখা যায় ? বিষণ্ণ করুণ।

মেয়েটার পড়ার শব্দে ফিরে তাকায় কমলেশ। বড্ড বেশী ঝুঁকে পড়েছে বইয়ের 'পর। কালিতে ছাওয়া কাঁচটা আলো ছড়াতে পারছে না। খুলে পরিষ্কার করতে গেলেই টুকরো হয়ে যাবে।

কমলেশ অনুভব করে, জীবনটা ক্রমশ দুবিসহ হয়ে উঠেছে। আর এভাবে পারছে না, চারিদিকে ধার দেনা। ডুবে যাচ্ছে কমলেশ,

অবশেষে তলিয়ে যাবে। লক্ষ্য করে, প্লাষ্টিকের ভাঙা চিরুণীটা দিয়ে চুলের জট ছাড়া, যন্ত্রণায়, বিরক্তি হচ্ছে। মনে হলো, সুলতার মুখখানি দিন দিন বিশ্রী এবং কুৎসিত হয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত দুঃখ দুর্ভাগ্যের সাথে যুদ্ধ করে শ্রান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ছে।

দূরে মন্দিরের পেটা ঘড়িতে ন'টা বাজলো। কমলেশ লেখাটা গোড়া থেকে পড়তে সুরু করলো মনে মনে, দু' একটা শব্দ পাল্টালো, নতুন কিছু বাড়ালো, অবশেষে বেশ পরিতৃপ্তির সাথে শেষ করলো একটা বিড়ি পেলে ভাল হতো। নেশাটা পীড়িত করছে কমলেশকে। হঠাৎ চোখ দু'টো উজ্জ্বল হলো, ভাবলো, আজ ঝন্টু টিউশনির টাকা পাবে। এক প্যাকেট সিগ্রেট কিনবে কমলেশ, উইলস্। ঝন্টুর টাকা সংসারের উপরি আয় অন্তত এই প্রথম মাসে। কমলেশের মন একটু বিলাসী হতে চাইল।

ন'টা বাজতেই সুলতাও ভাবছে। ঝন্টুত' এখনও এলো না। ওর টাকা থেকে একটা যশোরের চিরণী আর একটা লণ্ঠন কিনতে হবে।

খুকু ভাবছে, দাদা একটা জামা কিনে দেবে বলেছে। বাবা রোজই বলে, দেবো, দেবো, বেশ'ত চলছে। বাবার প্রতি অন্তত কথার প্রতি খুকু আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

—গল্পটা শেষ হলো?

—হ্যা।

—কি নাম দিলে?

—'জন্মদিন।'

বাইরে খুট করে শিকল নাড়ার শব্দ হলো। একটা অধৈর্য্য মুহূর্তের শেষে তিন জোড়া চোখ একসাথে হুমরি খেয়ে পড়লো দরজার 'পর।

ঝন্টু এসে ঘরে ঢোকে। কমলেশ দেখে, হাতে এক গোছা রজনী গন্ধা। এভাবে অপব্যয় করতে একটুকু বাধলো না। কমলেশ নিজেকে উত্তেজিত বোধ করে, কঠিন জলন্ত দৃষ্টিতে তাকায় ঝন্টুর দিকে।

—অবশেষে ফুল কিনে পয়সা নষ্ট করলি? তীক্ষ্ণ জ্বালাময়ী কণ্ঠ

সুলতার। রাগে থর থর করে কাঁপছে।

বিদ্যুৎ পৃষ্ঠের মত কমলেশ উঠে দাড়ায় এবং এগিয়ে ঠাস করে এক চড় কসায় ঝণ্টুর গালে। বাহারি ফুল কিনে বিলাসিতা করার মত পয়সা আমাদের সস্তা হয়েছে? বিদ্বেষের বাষ্প ছড়িয়ে গেল পাঁজরে পাঁজরে।

সুলতা হতভম্বের মত দাড়িয়ে থাকে। ঠিক এমন একটা বাড়া-বাড়ির জন্য যেন প্রস্তুত ছিল না। মমতা বোধ করলো ঝণ্টুর জন্য।

নাটকীয় দৃশ্যে বেচারা খুকুত হতবাক। তার মনে হলো বাবা আজকাল বেশী খিটখিটে আর বদরাগী হয়ে পড়ছে। এতটুকু বয়সে সে কখন' বাবাকে গায়ে হাত তুলতে দেখেনি।—আজ আমার জন্মদিন। এতক্ষণ পর ঝণ্টু কথা বলে। ফুলগুলো আমার ছাত্র দিয়েছে।

ঝণ্টু মাথা নীচু করে পায়ে হাত রেখে প্রণাম করে কমলেশকে।

কমলেশ পায়ের 'পর গরম তাপ অনুভব করে, সান্ত্বনা দেবার জন্য তার হাতটা ঝণ্টুর পিঠে নেমে আসে। বাবাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে ঝণ্টু। এই মুহূর্তে সমস্ত আবহাওয়াটা কেমন বিশ্রী অসহ্য মনে হয়। কি ভয়ঙ্কর লজ্জা, যন্ত্রণায় যেন তার মস্তিষ্কের বুদ্ধি এবং বোধশক্তি অচেতন হয়ে যাচ্ছে। বাইরে আকাশের দিকে তাকায় কমলেশ। তারাগুলো কাঁপছে, সব যেন কেমন ঝাপসা।

ঘুম

চিত্ত ঘোষাল

সাত সাতটা দিন পরে সে আজ ভাত খেয়েছে। সোনালী আট আনা পয়সা দিয়েছিল। ছ'আনায় ভাত ডাল তরকারী। আরো ছ'আনার ভাত।

এই সাতটা দিন তার কী করেই না কেটেছে। স্যাঙ্গাতদের কটা আস্তানা সে ঢুঁড়েছে, কারো পাত্তা পায়নি। কমতো নয়, চার চারটে বছর। কে কোথায় হারিয়ে গেছে। এক জায়গায় গেলে খাওয়া থাকা নতুন করে ব্যবসা সুরু করবার সব ব্যবস্থাই হত। কিন্তু আর সেখানে না যাবার কথাই সে চার বছর ধরে ভেবেছে। সাত সাতটা দিন তার কেটেছে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, রাত কেটেছে বাড়ীর রকে, পার্কের বেঞ্চে। বেরোবার সময় জমার পয়সা পেয়েছিল সে ছ' টাকা ন' আনা। এতে সে কষ্টে-সৃষ্টে চালিয়েছিল পাঁচ দিন।

সোনালীর কাছে যাবার মন ছিল না তার। তবু শেষ পর্যন্ত সেখানেই গিয়েছিল। না, পিরীত-টিরিত নয়। নেহাতই পেট নামে একটা জৈবিক যন্ত্রের তাড়নায়। মেয়েমানুষটা তাকে আট আনা পয়সা দিয়েছে আর সেই সঙ্গে দিয়েছে একটা জ্বালা।

সাতদিন হল সে জেল থেকে বেরিয়েছে।

প্রথম নয়, এই নিয়ে বার ছয়েক। তবে এবারের মেয়াদটা ছিল বেশী। চার বছর। শুধু চুরি নয়, চুরি আর জখম। লোকটা আরেকটু হলে হয়ত মরেই যেত। অথচ লোকটার উপর কোন রাগ থাকা তো দূরের কথা, তাকে সে চিনতই না কোন কালে। লোকটা জেগে চীৎকার করে উঠতেই একটা অদ্ভুত ঠাণ্ডা ভয়ে সে শিউরে উঠেছিল; তারপর সেই আতঙ্কের তীব্রতায় হাতের সিঁদ-কাঠিটা বসিয়ে দিয়েছিল লোকটার কাঁধে।

জ্ঞান হবার পর থেকেই জীবনটাকে সে একটা নির্বোধ যন্ত্রের মত আবর্তিত হতে দেখছে। এটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে তার একটুও বাধেনি। ছেলেবেলায় সে জেনেছিল তার বাবা নেই। আরো বড় হয়ে বুঝেছিল তার মত লোকদের বাবা থাকে না, থাকতেই নেই। এই সত্যটাকে মেনে নিতেও তার অসুবিধা হয়নি।

মেয়ে হয়ে জন্মালে ষোল নম্বরের সেই বাড়ীটায় তার কদর হত, খাইয়ে-দাইয়ে পুরুষ্টু করত তাকে সে বাড়ীর বারোয়ারী মেয়েমানুষ-গুলো। ছেলের বোঝা বইতে ওরা নারাজ। ছেলেবেলাটা কেটেছে তার তাচ্ছিল্য কুড়িয়ে।

বয়েসের সঙ্গে খোরাক বেড়েছে আর সেই সঙ্গে বেড়েছে গঞ্জনা। একটু বড় হতেই মা তাকে পাঠাল কাজের ধান্ধায়। সেদিনও যন্ত্রের তাল কাটেনি। নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিল সে। সন্ধ্যে হলে সে গিয়ে দাঁড়াত বড় রাস্তার মোড়ে। ফুলবাবু গোছের লোক দেখলে পিছু নিত, বিড় বিড় করে স্বগতোক্তির মত আউড়ে যেত—আসুন বাবু, ভাল জিনিস আছে, এসেই দেখুন একবার, পছন্দ না হয়···। খদ্দের জোটাত সে ঐ ষোল নম্বর বাড়ীর পশারিণীদের জন্যে। মাঝে মাঝে থানার গাড়ী এসে ধরে নিয়ে যেত রাস্তা থেকে। পাঁচ দশ টাকা ফাইন না হয় পাঁচ সাত দিনের মেয়াদ।

এমনি করেই হয়ত চলে যেত। কিন্তু ছেদ পড়ল সেদিন যেদিন চুল উঠে যাওয়া বড় কপালে দুশ্চিন্তার অজস্র কুঞ্চনরেখা নিয়ে তার মা ষোল নম্বরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে বেরিয়ে এল। স্বেচ্ছায় নয়। জোর জবরদস্তি করে তাকে বার করে দিল বাড়ীওলী। মেদবহুল বেঢপ চেহারার একটা মেয়েমানুষকে বসিয়ে খাওয়ানোর মত অঢেল পয়সা নেই বাড়ীওলীর।

মাকে সে গলির মোড়ে লালরংয়ের বাড়ীটার বারান্দার নীচে ভিখারীদের আস্তানা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। তারপর ধরলো উলটো রাস্তা। সিদে ওস্তাদ রামশরণের আড্ডায়। ছেলে চেনে ওস্তাদ। পনের দিনের সাগরেদিতেই তৈরী হয়ে গেল সে সিঁদচুরির কায়দা কানুনে।

শুধু পেশা নয়, চুরি হয়ে উঠল তার নেশা। যেনো মদের চেয়েও তীব্র, আগুন জ্বালানো নেশা। ভাল লাগত অন্ধকার। সেই অন্ধকারের আস্তর গায়ে মেখে সে অস্থির হয়ে উঠত। সে অস্থিরতা শান্ত হত যখন সে দিনের আলোয় যা কল্পনা করাও অসম্ভব এমন কোন অদ্ভুত কায়দায় চুরি করা মালের বোঝা নিয়ে ঢুকত ওস্তাদ রামশরণের আড্ডায়। মোটা বখরা ছিল তার। আর ছিল মদের বোতল।

প্রথম কয়েকটা মাস সে আর সবকিছুই ভুলে ছিল। তারপর সহজাত উচ্ছৃঙ্খল রক্তের প্রয়োজনই আবার একদিন তাকে টেনে আনল সেই পুরনো অনেক চেনা রাস্তাটার দিকে। কালোমত দীঘল চেহারার যে মেয়েমানুষটাকে প্রথম দেখল তার ঘরেই রাতের মত আস্তানা পাতল সে।

মেয়েটার মাঝে কী যেন একটা ছিল যেটা তাকে টানত। প্রথম প্রথম সে যেত সাত আট দিন পরে পরে একদিন। তার পর ঘন ঘন, তার পর রোজ।

ব্যাপারটা চাপা রইল না। আড্ডার সবাই হাসাহাসি করত। একটা বাজারের মেয়েমানুষকে নিয়ে অত মাতামাতি কিসের। অমন ঢের আছে। কাজকর্ম শিকেয় তুলে এ কি আরম্ভ করেছে সে।

বেঁটে ভোম্বল তো একদিন বলেই ফেলল—কিরে কেলে ময়নার পিরীতে পড়লি নাকি ?

—পীরিত না হাতি। নেশা রে নেশা, সিরেফ নতুন নেশা হেসে উঠেছিল সে হাহা করে।

সত্যিই নেশা। মেসিনের চাকা চালু রাখতে যেমন তেল এও তেমনি। দু'জনের সম্পর্কটা ছিল অত্যন্ত সহজ। পারস্পরিক প্রয়োজনের সম্পর্ক। একজনের প্রয়োজন ছিল দেহের আরেক জনের অর্থের। তবে শেষের দিকটায় সোনালী যেন কেমন দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল। অবাক লাগত তার।

পেটভর্তি ভাত সারা শরীরে একটা স্নিগ্ধ নেশার আমেজ ছড়িয়ে দিয়েছে। সাত সাতটা দিন পর আজ সে ভাত খেয়েছে। মনে পড়ছে

অনেক পুরানো কথা। ওরা বলে যে সে নাকি সোনালীর পীরিতে পড়েছে। যত্তো সব। পীরিত? কিন্তু সোনালী কি তাকে পীরিত করতো? হবে, হবে হয়তো।

অনেকগুলি দুর্বোধ্য ঘটনা আজ যেন সহজ হয়ে উঠেছে।

কার্তিকপূজো ছিল বোধ হয় সেদিন। খুব সেজেছিল সোনালী। সে ঘরে ঢুকতেই বলল,—কিরে মিনসে, বিয়ে করবি মোক্? বলে হেসে গড়িয়ে পড়ল গায়।

মেজাজটা খিঁচড়ে ছিল তার—বেবুশ্যের আর ভাতারে কাজ নেই।

—তুইও—। কে যেন একমুঠো ধুলো চোখে মুখে ছুঁড়ে কথা থামিয়ে দিল সোনালীর।

যান্ত্রিক বুদ্ধিটা একটু হোঁচট খেয়েই আবার চলতে সুরু করেছিল আগের মত।

অনেকদিন খুব ঘটা করে তাকে রেঁধে খাইয়েছিল সোণালী। নিজের খরচায়। পয়সা দিতে চেয়েছিল সে। নেয়নি সোনালী, বলেছে, আজ যে জামাইষষ্ঠীরে। শাউড়িতো আর তোর বরাতে নেই তাই মোকেই করতে হচ্ছে। সে রাতটা তারা ছাদে বসে গল্প করেই কাটিয়ে দিয়েছিল।

পীরিত? এর নামই কি পীরিত? হবে, হবে হয়তো।

ঘুমে ভেঙ্গে আসছে পা দুটো। ভাত না খেলেই হত। না, না, ঘুমোলে চলবে না। ভুলুর কাছ থেকে চেয়ে আনা কোমরে গোঁজা সিঁদকাঠিটাকে হাত দিয়ে অনুভব করল সে। কিছু রোজগারের ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে আজ। অথচ পুরো চার বছর ধরে এ পথ ছাড়বার কথাই সে ভেবেছে। বিবেকের কোন বিশেষ তাড়নায় নয়, সোনালীর জন্যেও নয়। ওই নীল রঙের আকাশটার জন্যে। চার বছরের মেয়াদ খাটবার সময় তাকে সবচেয়ে কষ্ট দিয়েছে ওই আকাশটা। জেলের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি সে মেনে নিয়েছিল, মেনে নিয়েছিল ওয়ার্ডারের হুকুমের জুলুম। আধপেটা লপ্‌সিও তাকে হার মানাতে পারেনি। হার মানিয়েছিল ওই আকাশটা। জষ্টি মাসের খাঁ খাঁ রোদ্দুরে জেল চত্বরের

ওপর গোল আকাশটা যখন নির্জীব হয়ে ঝিমোত তখন সে একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠত।

জেল থেকে বেরিয়ে এই সাত দিনে অনেক কষ্টই সহ্য করতে হয়েছে। ওই মস্তবড় আকাশটার সঙ্গে একটা পাকাপাকি সম্পর্কের আশায় সে কাজ খুঁজেছে। খেটে খাওয়ার ধান্ধায় ঘুরছে এখানে ওখানে। নিজের অযোগ্যতার চৌকাঠে হুমড়ি খেয়ে ফিরে এসেছে সব জায়গা থেকে। নিজের শেখা ও জানার জগতের সংকীর্ণতা তাকো ভয় পাইয়ে দিয়েছে। দু'টাকা ন'আনার শেষ সম্বলটুকুও নিঃশেষ হয়ে এসেছে। তবু, তবু একটু আগে পর্যন্ত সে সিধে ছিল। কিন্তু সোনালীটাই সব গোলমাল করে দিল।

সে ঘরে ঢুকতেই মেয়েমানুষটা অনেকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের পানে তাকিয়ে থেকে বলল—ফিরে এয়েছিস্?

সেই ঘর। সেই আসবাবপত্তর। আধ-ন্যাংটা যে মেয়েমানুষের ছবিটাকে নিয়ে হাসাহাসি করত তারা সেটাও আছে। তবু, সব থেকেও কী যেন নেই। একটা ময়লা আস্তরে ঢেকে গিয়েছে যেন ঘরের জেল্লাটা—সোনালীও। চোখ দুটো সেঁধিয়ে গিয়ে কপালটা ঠেলে বেরিয়ে আসার মত হয়েছে। মুখে, দুটো হাতে কালো কালো দাগ। এ দাগ অচেনা নয় তার। ফুরিয়ে এসেছে সোনালী।

এবার দালান ছেড়ে খোলার ঘরে উঠতে হবে সোনালীকে, সেখান থেকে নামতে হবে রাস্তায়। বায়োস্কোপের ছবির মত পর পর সে যেন দেখতে পেল সোনালী, ভিক্ষে করছে, হাতে একটা চটা ওঠা কলাইয়ের তালা। হামাগুড়ি দিচ্ছে কুকুরের মত, পা দুটো অসাড়। চুল ওঠা সাদা মাথাটা ডিমের মত। চটচটে লালায় ভেজা কষে দুটো একটা ভাত, ডালের লল্‌দে ছোপ। সব যেন গুলিয়ে গেল তার। যান্ত্রিক বুদ্ধিটা এই প্রথম একটা তীব্র প্রতিবাদ করে স্তম্ভিত হয় গেল।

—খাস্‌নি বুঝি? নে এটা নে। তার হাতে একটা আধুলি গুঁজে দিয়ে বলল সোনালী—আর তো নেই। নে, খেয়ে আয়।

চাবুক খাওয়া কুকুরের মত ছুটে বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে।

পুরুষমানুষের অক্ষমতার জ্বালা এই সে প্রথম অনুভব করল। চার বছরের সাধটাকে সে জোর করে সরিয়ে দিল মন থেকে। আর কিছু না হোক অন্তত বদন ডাক্তারের ওষুধ খাইয়ে সারিয়ে তুলতে হবে সোনালীকে। তার জন্যে চাই টাকা। সোনালীর খাওয়া পরার জন্যেও চাই টাকা। আসবে কোত্থেকে এত টাকা। চুরি ছাড়া আর কিছুই সে পারে না। হ্যাঁ চুরিই করতে হবে তাকে। আকাশটা কি হেরে গেল সোনালীর কাছে? আকাশে আর সোনালীতে তো বিরোধ নেই কোন। নাঃ, এসব কথা বোঝাবার নয় তার।

কী ঘুমই না পাচ্ছে। ঘুমে ভারী হয়ে আসা শরীরটাকে টান টান করে নিয়ে চলার বেগ বাড়িয়ে দিল সে। তবু অবাধ্য ঘুমটাকে সে তাড়াতে পারছে না। জেগে থাকতে এ নাছোড়বান্দা ঘুম তার ছিল কোথায়। মাঝ রাতে যারা ছায়ার শরীর নিয়ে লোকের পিছু নেয়, সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ত চুষে খায় গলার নালী ছিড়ে, ঘুমটা যেন তাদের মত। পাহারাওলার বুটের শব্দ কথাটা মনে পড়িয়ে দিল তাকে। একটা ডাস্টবিনের আড়ালে বসে পড়ল সে। কয়েকটা মুহূর্ত ঘুমের আমেজ ভুলে শিকারী বেড়ালের মত সতর্ক হয়ে রইল আত্মরক্ষার তাগিদে। পাহারাওলার লম্বা ছায়াটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে ঘুরে গেল বড় রাস্তার দিকে। শক্ত করে ধরে থাকা নোংরা মাখানো ডাবের খোলাটাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। বিশ্রী বোট্‌কা একটা গন্ধে নাক জ্বলে যাচ্ছে।

ঘুমের নেশাটা পালিয়েছে আপাতত। আর দেরী নয়। সামনের অন্ধকার চারতলা বাড়ীটাই আজ শিকার হবে তার। গলিটা বেশ অন্ধকার। শুধু গ্যাসবাতিটা। এক মিনিটের মামলা, গলিটা একটা সাদাটে স্বচ্ছ অন্ধকারে ভরে উঠল। না, চার বছরের অনভ্যাসেও জড়তা আসেনি তার। আগের মতই চোখ কান খোলা আর চটপটে আছে সে।

জল নামবার পাইপটাকে বারকয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে দেখে নিল সে। মজবুত লোহার পাইপ। ভেঙ্গে পড়বার ভয় নেই। আরেকবার চোখ

বুলিয়ে নিল চারদিকে। তারপর তর তর করে পাইপ বেয়ে উঠে গেল ছাদে।

মস্তবড় ছাদ। কাপড় শুকোবার জন্যে অনেকগুলো দড়ি খাটানো। অনেক ভাড়াটের বাড়ী বোধ হয়। একটাই সিঁড়ি ছাদের। সিঁড়ির মুখের দরজাটা বন্ধ ভেতর থেকে। দরজার উপর পিঠ রেখে সমস্ত শরীরে চাপ দিয়ে দেখল সে, শক্ত দরজা, বিনা অস্ত্রে খোলা যাবে না নিঃশব্দে। সিঁদকাঠির চাড় দিলে শব্দ হবে। না, সিঁড়ি দিয়ে ঢোকা যাবে না, অন্য রাস্তা খুঁজতে হবে।

শেষ বিড়িটা ধরিয়ে রেলিংয়ের পাশে এসে দাঁড়াল সে। হাই তুলল বার কয়েক। কাপড়ের খুঁটে ভিজে চোখ দুটো মুছে নিয়ে অনেকক্ষণ ঝুঁকে তাকিয়ে রইল নীচের দিকে। ভেতরের দিকে পাইপ নেই একটাও।

তাড়াহুড়োর আর মনের ছটফটানিতে কাজটা ভালো করেনি সে। রামশরণের আড্ডা হয়ে কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে এলেই হত। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। আবার হাই তুলল একটা। চোখ মুছল। শুধু হাতেই ফিরতে হবে আজ। একটু বোকামীর জন্যে সব বরবাদ হয়ে গেল। রেলিংয়ে হেলান দিয়ে বসে পড়ল সে।

হাই তুলল আবার। উঃ মাথাটা কী ভারী। ঘুমের ওষুধ কি ভাত থেকেই তৈরী হয়? হেলান দিয়ে বসে থাকা হাঁটার চাইতেও কষ্ট। একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক। শেষ রাত্তিরে নেমে গেলেই হবে। বাঁ হাতটা ভাঁজ করে বালিশের মত মাথার নীচে রেখে শুয়ে পড়ল সে। যদি ঘুমিয়ে পড়ে, যদি সকাল সকাল ঘুম না ভাঙে। দূর তা কি হয়। ঘুমোবে কেন? একটু গড়িয়ে নেব শুধু।

চোখ বড় বড় করে ওপর পানে তাকাল সে। আকাশটা কেমন ফিকে ফিকে নীল। দু'একটা জায়গায় কালো কালো ছোপ। সোনালীর মুখের কালো দাগগুলোর মত। আকাশের কালো ছোপ-গুলো হয়তো সকাল বেলায় মিলিয়ে যাবে। সোনালীর মুখের দাগগুলোও কি মিলিয়ে যাবে? আলবৎ যাবে। হাজারবার যাবে।

বিড় বিড় করে বলে উঠল সে। চোখ খোলবার চেষ্টাও করল, পারল না।

আকাশটাকে আজ বড় ভালো লাগছে। জেলখানার ওপরের গোল আকাশটার মত এ আকাশটা যন্ত্রণা দেয় না। বড় ভালো লাগছে। ভালোই হয়েছে আজকের চুরির মতলবটা ভেস্তে গিয়ে। মনে হচ্ছে আকাশের সঙ্গে সোনালীর একটা রফা সে করতে পারবে। চার বছরের সাধটা তার বরবাদ হবে না। ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে যন্ত্রপাতি না এনে। আনতে তার চুরি কেউ ঠেকাতে পারত না।

কিন্তু এত জোর সে পেল কোথায়? এত ভরসা তার এল কোত্থেকে?

সোনালীর মুখের দাগগুলো মিলিয়ে গেছে। আকাশটাও নীল, একটুকরো কালো নেই কোথাও। আস্তে আস্তে আকাশটা হয়ে গেল মস্তবড় একটা সবুজ মাঠ, তারপর হল একটা বয়লারের পিঠ। কয়লা ঢালছে সে। হাত দুটো তার ফুলে ফুলে উঠছে কাজের সঙ্গে সঙ্গে। একটুকরো হাসি তার মুখে ছড়িয়ে পড়ল। পা দুটো মুড়ে পাশ ফিরল সে।

সে ঘুমোল। বাঁ হাতটা মাথার নীচে। চোয়াড়ে মুখে এক চিলতে হাসি। তার জীবনে আকাশ আর সোনালীর রফা হয়ে গেছে, সেই আনন্দে সে প্রশান্ত।

* * *

এবারের মেয়াদ হল তার তিন বছর।

শুধু-সংবাদ

অদ্বৈত চক্রবর্তী

শ্রাবণ মাস—থেকে থেকে বৃষ্টি হয়েছে সারাদিন। রাতেও তার কামাই যাচ্ছে না। রেনকোট ও ছাতার স্বল্প গতায়াত। নেহাৎ খালি মাথায় পদতাড়নার অভাব নেই। বেশী চেপে এলে অনেক বাড়ীর গাড়ী বারান্দায় খানিক অপেক্ষার পর আবার পদতাড়না। কার্ণিশের সরু আচ্ছাদনে মাথা বাঁচিয়ে নটবর দাঁড়িয়ে আছে একটা বাড়ীর গায়ে ঠেস্ দিয়ে। মাথা বাঁচলেও বাতাসের আলিঙ্গনে তার সর্বাঙ্গে জলের প্রলেপ। একমুখ দাঁড়ি গোঁফে জালের মত ছেয়ে থাকা জলবিন্দু রাস্তার আলোয় চিক চিক করে। ত্রস্ত পথচারীর চোখে ফোটে বিস্ময়। নটবর নির্বিকার। এক টুকরো কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করে নির্লজ্জ শোভাতুর চোখ দুটি মেলে চেয়ে আছে উল্টোদিকে লাল নীল আলোয় সাজানো বড় বাড়ীটার দিকে। বাড়ীটার ওপর নজর রেখেছিল নটবর ছাদে ম্যারাপ বাঁধার দিন থেকেই। আজ দোরে ঘট বসানো দেখে সন্ধ্যা না হতেই গোটা সংসার নিয়ে চলে এসেছে সে। ছেলে মেয়ে নিয়ে বৌ বসে আছে সামনে 'বাস-স্টপের' চিলতে ছাদের নীচে। বাইরের জাঁক জমক থেকে ভেতরের ব্যাপারটা আঁচ করে দুর্দমনীয় খিদের অনুভূতিতে নটবর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বৃষ্টি ঝরা শ্রান্তরাতে রঙীন আলোর ছটা ক্লান্ত নটবরের ড্যাব ড্যাবে তামাটে চোখের সামনে কবেকার হারিয়ে যাওয়া একটা ছবি তুলে ধরে। গায়ের ছবি—সেখানেও বৃষ্টি হচ্ছে আকাশ ভেঙ্গে। ডোবা ডাঙ্গায় জল জমেছে। মাঠে মাঠে লাঙ্গল চলেছে। টোকা মাথায় ব্যস্ত চাষী উবু হয়ে বসে ধানের চারা লাগাচ্ছে নরম মাটির বুকে। বাতাসের বুকে জল-ভেজা মাটির সোঁদা সোঁদা প্রাণমাতানো গন্ধ। নটবরের সম্বিত ফিরে আসে রাস্তার পাশে ডাষ্ট-বিনের পচা গন্ধে। ঢুলে আসা চোখ দুটি খুলে যায়। রাত অনেকটা

হয়ে গেছে অথচ—বিরক্তিতে কুঞ্চিত হসে আসা মুখটা হঠাৎ হাসিতে ভার ওঠে। আসছে ঝুড়ি ভর্তি পাত ফেলতে ‘হ্‌ঁাদে দেখতে পাচ্ছিস না ইদিকে’? হাক ছাড়ে নটবর ‘বাস ষ্টপের, দিকে তাকায়ে। ভীড় করা ভাগীদারদের ঠেলে ছুটে গিয়ে জ্‌ঁাকিয়ে বসে। এক কণা বেহাত হলে চলবে না। অনেকদিন পরে ভোজ। সুগন্ধে মুখে নালা ভরে আসে নটবরের। বৌ এসে বসে পড়ে নটবরের পাশে। চার হাতে কাজ সুরু হয়। পাতা থেকে আধ খাওয়া লুচি, মাছ মাংসের টুকরো জমতে থাকে মাটির খুরিতে, পাতায় লেগে থাকা ঝাল, ঝোল রসের অপূর্ব সংমিশ্রণ চেটে রসাপ্লুত হয়ে ওঠে নটবরের ছেলেমেয়ে তিনটি। কেমন একটা পশু পশু ভাব্ জেগে ওনে নটবরের চোখে। সম্পূর্ণ অতীতটাকে খুইয়ে বসে আছে সে। তবুও হারিয়ে যাওয়া ছবি ফিরে আসে মনে। নিঃশব্দ কাজের ফাঁকে অতীত ফিরে আসে বর্ত্তমানের পাশে। বনমালী ভুঁইদাসের ছেলে নটবর ভুঁইদাস মাটির বুক চষে খাবার আদায় করত। পরের জমিতে আধির কাজে হয়ত পেট পুরত না দু’বেলা। তবু পাত চাটতনা কারো। কিন্তু সেবারের আকালে সবকিছুই পাল্টে গেল। জোতদারের হাতে হালের গরু, লাঙ্গল তুলে দিয়েও পেট ভরল না। পোড়া পেটের জ্বালায় বাঁচার তাগিতে পদযাত্রায় বেরিয়েছিল নটবর দীর্ঘ কষ্টকর পথে। শুনেছিল অনেকের কাছে শহরের বাতাসে টাকা ভেসে বেড়ায়। কিন্তু হাত দিয়ে ধরার কায়দা জানা ছিল না কারো। তাই শহরে এসে নটবরের সবই মনে হয়েছে অন্ধকার। খিদের মত অন্ধকার। চেষ্টা করেছিল দেখবার, কিন্তু গ্রাম্য অন্ধতার হাত এড়িয়ে চোখ ফোটেনি। তাই ফুটপাতের বিশাল সাম্রাজ্যের মাঝে বৌ ছেলেমেয়ে ফেলে পালিয়েছিল নটবর। তবে বেশিদিন দূরে থাকতেও পারেনি। ফিরে এসেছে আবার। তবে সেটায় প্রয়োজন অনুভব করেছিল নিজের পেটের জন্য। নিত্য নতুন ভিকির করেও ভিক্ষে জোটাতে না পেরে নটবর বৌ ছেলেমেয়েদের ভিক্ষালব্ধ অংশে প্রায়ই ভাগ বসায় জোর ঘটিয়ে। তাই খুশীর বদলে নটবরকে দেখে ভয় পায় ওরা; কাছে এসে কথা বলে না কেউ। ক্ষুদে মেয়েটা পর্যন্ত খিদে পেলে কাঁদে না ওর সামনে। বৌয়ের

বোবা চাহুনিতে দেখেছে ফাঁদে পড়া বাঘিনীর দৃষ্টি। তবু কোন বাঁধা মানে না নটবর। গাঁয়ের কোন চিহ্নও আজ ওর মাঝে নেই। একেবারে সহুরে ভিখিরী বনে গেছে। কদর্য ভারায় গালি দেয়, লাথি মারে বৌকে—তবু অতীত অতীত হয়েই থাকে না। ফিরে আসতে চায় বর্তমানে। নটবরের চোখ দুটো নরম হয়ে আসে—সব মনে হয় সেদিনের কথা।

আবার ঝুড়ি ভর্ত্তি পাতা নিয়ে আসে। নটবর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ফের পাতার ওপরে। ভাগীদারদের জ্বালায় পাত কুড়োনো দায়। গণ্ডা কয়েক খেঁকী কুকুর ঘিরে রয়েছে চার পাশে। সুযোগ পেলেই পাতা মুখে ছুট দেয়। হুস্ হাস্ করেও তাড়াতে পারে না নটবর। একেবারে নাছোড়বান্দা।

'তাড়া না হারামীগুলোকে।' ছেলেমেয়েদের দিকে গর্জে ওঠে নটবর। কুকুরের পেছনে তাড়া করে ওরা। ওদের দড়ি পাকানো চেহারা ধূলোকাদার প্রলেপে অমানুষিক রূপ ধরেছে। বৃষ্টি ভেজা জিরজিরে বুকের পাঁজর। শংকা হয় খুলে আসবে হয়ত। তবু ক্ষুধার্ত্তের আকৃতি নিয়ে ওরা ছুটে ছুটে বাধা দেয়। কিন্তু বিনা যুদ্ধে ভাগ ছাড়তে রাজী নয় কুকুরগুলো। সমস্বরে প্রতিবাদ করে। মাঝে মাঝে হন্যে হয়ে ছুটে আসে বাধা অগ্রাহ্য করে। নটবর আগলে রাখে প্রতিটি পাতা মুড়ে আঙুলে কেচে না নেওয়া পর্য্যন্ত। তবু জমছে না কিছু। ক্ষুধার তীব্রতার সঙ্গে থুরিতে জমানো খোরাকের পরিমাপ করে মনে মনে গজরায়: 'হাভাতের দল পাতে বলতে কিছু রাখছে না। শালারা পাতাগুলো সব কুকুর চাটা করে ছেড়েছে।' সরবে নীরবে খিস্তি দেয় নটবর বিয়ে বাড়ীর লোকগুলোর উদ্দেশ্যে। চোখ বাঁকিয়ে তাকায় একবার বৌ-এর দিকে। নিঃশব্দে পাতা কাচিয়ে যাচ্ছে সে। কেমন অনুভূতিহীন, দুর্বোধ্য। জীবনের সব কিছু খুইয়ে যেন বোবা হয়ে গেছে। শহরে যান্ত্রিক মুখরতার খেই হারিয়ে ফেলা অসহায় জীব। ছোট মেয়েটাকে কোলে নিয়ে সকাল বিকেল বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে করে। তখন শুধু বুকফাটা আওয়াজ তোলে: দুটি ভাত হবে মা? 'দুটি ভাত হবে মা।'

কোলের মেয়েটাও মায়ের অনুকরণে গলায় সুর তোলে। তারপর সারাদিন রাস্তায় পড়ে থাকা। চাষীর বৌ ধান ভানা, ধান ঝাড়ার বদলে শহরের কংক্রিট বাঁধানো পায়ে চলার পথে উপোসী পেটে পড়ে থাকে সারাদিন। 'খিদে পেয়েছে মা।' বড় মেয়েটির সঙ্গে ছোট দুটিরও লোলুপ দৃষ্টি মাটির খুরির দিকে। বিশ্রী গলায় চেঁচিয়ে ওঠে নটবর খুরিগুলো পাতা দিয়ে ঢেকে ফেলে: 'হারামজাদি, বলছি কুকুরগুলো তাড়াতে। সেকথা কানে যায় না—খিদে পেয়েছে', ভেংচে ওঠে নটবর, 'তোর খিদের নিকুচি করেছে!'

ঘণ্টা কয়েক চেষ্টায়ও পাঁচজনের আধপেটা খাবারেও যোগাড় হয়নি। সুযোগ বুঝে এবারে খেয়ো কুকুরটা পাশ থেকে একটা পাতা তুলে নিয়ে ছুটে পালায়। এক টুকরো লুচি ছিটকে পড়ে জল-কাদায় মাখামাখি হয়ে যায়।

হাঁ হাঁ করে চেঁচিয়ে ওঠে নটবর। কষে চড় লাগায় মেয়েটার গালে। কুৎসিত গালাগালিতে মানুষ কুকুরের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দেয়। 'মা—ইটা', আধ খাওয়া রসগোল্লা পাতায় দেখে কোল ঘেঁসে দাঁড়াল ছোট মেয়েটা হাত বাড়িয়ে ধরে। চোখ এড়ায় না নটবরের। থাবলে নিয়ে নেয় মেয়ের হাত থেকে। খুরিগুলো ভরেনি এখনও।

'হারামজাদীদের বলছি কুকুর তাড়াতে, তা কুত্তির বাচ্চারা কান দেবে কথায়।' বৌয়ের ওপর রাগটা যেন চেপে আসে নটবরের। ভাগীদার বলে মনে হয় বৌকে। কুৎসিত গালি দিতে গিয়ে থেমে নটবর। বৌ-এর ভাবলেশহীন দৃষ্টিটা যেন আটকে গেছে নটবরের মুখের উপর। অদ্ভুত ভয় পাওয়া বিবর্ণ মুখ। খাবারের খুরিগুলো নিয়ে সরে না পড়ে নটবর। অনেকদিনের অভিজ্ঞতায় নটবরের উপস্থিতি ভয় ধরিয়ে দেয় মনে। তবু তাকিয়ে থাকে বৌ, চোখে বোবা চাহনি নিয়ে। তীব্র সন্দেহের প্রশ্ন যেন। নটবর চোখ নীচু করে। মেয়েটা রস মাখান আঙুল মুখে পুরে ছুটে ছুটে কুকুর তাড়ায়। ছোট ছোট কচি আঙুল রসে মাখা মিষ্টি, খু-উ-ব মিষ্টি। ধিকি ধিকি খিদের মুখে জল উঠে, কষ বেয়ে রস পড়ে, আর কুকুর তাড়া করে মেয়টা।

বিশ্রী কর্কশ আওয়াজ। এত বড় বাধা পেয়েও নতুন মডেলের 'এ্যাম্বাসাডার' খানা মুহূর্ত না থেমে বৃষ্টি ধোওয়া রাস্তায় সমান্তরাল দাগ টেনে দিয়ে সবেগে মিলিয়ে যায়। বৌ উঠে দাঁড়ায়। নটবর পাতা থেকে চোখ নামাল বৌ-এর দিকে। তারপর শোনে গগনভেদী আর্তনাদ। বৃষ্টি ধোওয়া কালো পীচের রাস্তায় বহুদূর সমান্তরাল রক্ত রেখা ফুটেউঠেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থমকে যায় নটবর। রক্ত-মাংসের বমি-বমি করা দৃশ্য। দড়ি পাকানো শরীরে এত রক্ত। তাকাতে পারে না নটবর—চেপটে থেঁতলে চৌচির হয়ে যাওয়া দেহটার দিকে।

'পুঁটি—ওমা পুঁটি', মুক মুখর হয়ে উঠেছে একটানা কাতরানির শব্দের মধ্যে। মনে পড়ে নটবরের গ্রাম ছাড়বার আগে কোলের মেয়েটার নাম দেওয়া হয়েছিল পটেশ্বরী। পটে আঁকা ছবির আদল ছিল। ছিল মেয়েটার চোখেমুখে। বৌ নাম রেখেছিল পটেশ্বরী।

পুঁটি—মাগো—ঝট করে মনে পড়ে খুরিগুলোর কথা। বিকাল হয়ে আসা দেহটা সটান হয়ে ওঠে। দ্রুত পায়ে ডাষ্টবিনেরপাশে চলে আসে নটবর।

খ্যাঁক খ্যাঁক। ঘেয়ো কুকুরটা খেঁকিয়ে ওঠে। খুরিগুলো সব উলটে রয়েছে। নটবর ফিরে তাকায়। রাস্তার দিকে তালগোল পাকান দেহটার পাশে বৌ পড়ে আছে। স্বপ্ন ঘোরো যেন এগিয়ে যায় নটবর:

বৌ—বৌ—পুরোনো দিনের সহজ ডাক। হাত ধরে তুলে নেয় বৌকে। বৌ-এর চোখে বিস্ময়। নটবর ছেলেমেয়েদের হাত ধরে এগিয়ে চলে। যেখান থেকে একবার ফিরে এসেছে, সেই সোঁধা গন্ধের জলে ভেজা কাদা মাটির দেশে ফিরে যাবার সব রাস্তা বন্ধ। নটবর সেটা বোঝে তবু মন মানে না। এগোতে থাকে পেছনে আর না তাকিয়ে—ফুটপাতের বিশাল সাম্রাজ্যের অন্য কোন প্রান্তের দিকে। বুঝতে পারে না যে কি হচ্ছে। শুধু অনুভব করে নটবরের শক্ত পিঠের ওপর ভর দিয়ে সে এগিয়ে চলেছে।

পরদিন সকালে কাগজে খবর বেরোয়, যেমন বহুদিন আগে একবার খবর বেরিয়েছিল ছবি ছাপিয়ে: 'জঙ্গীপুর গ্রামের কৃষক অনাহারের জ্বালায় গ্রাম ছাড়িয়া শহরের ফুটপাতে...।'

আজও খবর বেরোলো: 'গাড়ী চাপা পড়িয়া অজ্ঞাত নাম্নী বালিকার মৃত্যু।. এবারে আর ছবি ছাপেনি।

ভক্তি ঠাকুর

ভাঙ্গা মোড়টায় বসে দুধ দোয়ানো দেখছিলাম গয়লার। পূর্বে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। সবুজ ধানের ক্ষেতে, নীলাকাশের, আর আম-বাগানের উপরে শুভ্র জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। এক মায়ালোক। বাগানের ভেতরে জোনাকি, ঝিঁ ঝিঁ, নীড়-ফেরা পাখীদের কিচির মিচির। টিম-টিমে ভূষোপড়া লণ্ঠনটা বেমানান, বড় বাস্তব। কালা পাহাড়ের মত গাইটা জাবর কাটছে আপন মনে। তার চায়টে-স্তনকে এক ভোজপুরী জোয়ান যে টেনে চলেছে বীর-বিক্রমে সেদিকে খেয়াল নেই। মাঝে মাঝে বাচ্চাটা গোঁজ উঠাবার চেষ্টা করছে। আর আমার দিকে তাকাচ্ছে। সে দৃষ্টিতে মিনতি, ঈর্ষা, কিংবা আক্রোশ কি একটা আছে, বোঝা ভার।

কিন্তু গয়লা যেমন নির্মম, তেমনি খরিদ্দার। উপায় নাই। গিন্নীর সত্যনারায়ণ পূজায় দুধ না গেলে সিন্নি হবে না। পেটের ছেলে হরলিক্স, গ্লাক্সো, মায় পাউডার-দুধ পর্যন্ত খেতে পারে, সেটা নিত্যই খায় এমনকি আর। কিন্তু সারামাসে সত্যনারায়ণ একবার! হে বাধা, সত্যনারায়ণ! মনে কিছু করো না। এই ভীমরতি ধবার জন্যেই তো মানুষের এত দুঃখ-কষ্ট, অধঃগতি। তাই সাহেবের নজরে না পড়ে, হবো-হবো প্রমোশনটা হচ্ছে না আমার। এরি মধ্যে কতজনের কত কি হয়ে গেল তেলিয়ে তেলিয়ে। দেবতাকে, সাহেবকে। তৈল না মাখালে হবে কি ক'রে? ঠাকুরকে পূজা না দিলে বর দিতে মন উঠবে কেন? লক্ষ্মীছাড়ার প্রতি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়া কি এতই সহজ? দুধের বদলে জল দিলে কপালটাই জলো-জলো হবে না? অগত্যা গৃহিণীর তাড়নায় বলুন, কিংবা ভাবী প্রমোশনটার জন্যই বলুন, এই ভর-সন্ধ্যায় বেসাচিতি থেকে দেড় মাইল পথ ভেঙ্গে এসেছি

দুধের সন্ধানে। ধর্ণা দিচ্ছি।

'ঝারলে' দুধ নিয়ে পয়সাটা মিটিয়ে দিচ্ছি। এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে ঝড়ের মত ঢুকলো দুলালী। আমার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে গয়লাকে বললে, আমার দুধ?

—আজ আর হবে না। এই বাবুর ঠাকুরপুজো তাই দিতে হলো। কাল সকালে লিস্। গয়লার নির্বিকার জবাব। কুতকুতে চোখ দুটো আরও ছোট হোলো।

—তা কি ক'রে হবে রে? বৈজু-মণ্ডলী যে উপোস্ থাকবে সীতারামিয়া। সারাদিন কিছু খায়নি। ভজুয়া একটু না খেলে যে বল পাবে না। উপায় কর, ভেইয়া, না হ'লে সর্বোনাশ হবে। হতাশা ঝরে পড়ে কণ্ঠে।

—আজ আর হবে না। সব বিক্‌কি হয়ে গেইল। পাউডার কিনে নিয়ে যা···এই বলে ঘরের দিকে পা পাড়ালো সীতারামিয়া।

সীতারামিয়ার দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল দুলালী। বৈজুকে পাউডার দিলে চলে, কিন্তু মণ্ডলী দুধ ছাড়া কুছ্ খায় না সীতারামিয়া। ভাল করে ঘাসও খেতে শেখেনি, তা' কি জানিস না। যে পয়সা ছিল ভজুয়ার দাওয়াই কিনতে চলে গেল। আজকের মত দে ভেইয়া, কাল তুর সব পয়সা দিয়ে দিব।

জিব উল্টে মাথা নেড়ে ব্যঙ্গ যেন ফেটে পড়ে।—পয়সা! পয়সা তুই হর রোজই দিচ্ছিস্। যা, যা, হবে না, ভাগ।

এতক্ষণে আসল কথাটা প্রকাশ পেলো। এখনও বালতিতে যথেষ্ট দুধ তো গয়লার। কিন্তু ওর মিথ্যা কথায় যতটা আশ্চর্য না হয়েছি, দুলালীর দুধ কিনতে আসাতে হয়েছি আরো বেশি। যে মানুষটা বিক্রেতা হবে, কত শত লোককে সকাল-সন্ধ্যা বালতি বালতি দুধ 'রোজ' দিয়েছে, সে আজ দেউলিয়া হয়ে গেল কি ক'রে? সমুদ্রে ক্ষুদ্র ভিক্ষাপাত্র হাতে, এও কি?

বছরখানেক আগে আমি যখন 'ষ্টিল প্রজেক্টে' ঢুকি, তখন এক সুন্দর শরতের সকালে দেখেছিলাম দুলালীকে। সতেজ, শুভ্র শিশির-

ভেজা একটি শেফালী। আঠার বছরের তরুণী, গৌরী, সুন্দরী। কলাপাতা-রঙের ডুরে শাড়ী কোমরে ফেরতা দিয়ে বিচিত্রভাবে বাঁধা। পুষ্ট দেহ, উন্নত বুক, হাসি মুখ। হাতে রঙীন কাঁচের চুড়ি, রূপোর বাজু বালা, গলায় সোনার বিছে হার, কানে মাকড়ী। পায়ে মল বাজনা বাজায় পদক্ষেপে। বেণী বাঁধা চুলে ফুল, মুখে পান। কপালে উল্কি, যেন সরু কাঁচপোকার টিপ। হাতে লেখা ভজুয়া, স্বামীর নাম। কাঁখে বড় দুধের কলসী, মাথায় বেড়ির পরে আরেকটা হাতে বালতি। বিহারের কোন গাঁও থেকে এসেছে ব্যবসা করতে। গোটা বিশেক বড় গরু, গোটা দশেক মোষ।

মেসের কমলদা চিনিয়ে দিলেন, এ হচ্ছে দুলালী। কিন্তু তিনি এর নাম দিয়েছেন 'দুর্গাপুরের দুধওয়ালী'। এর কাছে খাঁটি দুধ পাওয়া যায়। আর যাদের আছে, তাদের দুধ গোলা পাউডার। তা' খেয়েও যা ফল, না খেয়েও তাই।

মনে মনে হেসেছিলাম। দুধের খাঁটিত্ব খুঁজতে এক খাঁটি রূপই আমদানী করেছেন, সেজন্য বাহবা না দিয়ে পারলাম না। চোখ আছে।

—'দেখছিস না, ছিলো ত' একটা জঙ্গল। হঠাৎ হুড়্-হুড়্ করে এলো মানুষ। জঙ্গলে মাকাল পাওয়া যায়, ফল নয়। কন্‌ষ্ট্রাক্‌শন পিরিয়ড, সবই পকেট কাটা দর। বাজারে কিছু ত' পাওয়া যায় না। মাছ ৪৲, তাও পড়তে পায় না। মাংস ভেজাল,—শাকসব্‌জী শুকনো, বাসি—দামে আগুন। ঘি ত' ডুমুর ফুল, দেবভোগ্য। একটু খাঁটি দুধ-টুধ না খেলে উদরান্ত পরিশ্রম করবো কি করে? ব্যাটারা কন্‌ষ্ট্রাক্‌শন অ্যালাউন্স দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছে। সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত নাকে দড়ি দিয়ে চরকি ঘোরাচ্ছে, চরকি! নাকি বল দুলালী?

—তা বৈকি বাবু! নাকে নথ নেড়ে, হাত নেড়ে বলে, করছিস্ ইয়া বড় কারখানাটো আকাশ ছুঁই-ছুঁই বাড়ী, গণ্ডাখানেক চোঙা, দুকানের জিনিসগুলো সুবিস্তা কর। পেট ভরে খেতে না পেলে লোহা ঢালায়-মাসায় করবে কি ক'রে মানুষ? মানুষ ত' টাক্‌টর, মোটর, ড্যামপর

যন্তর নয়···আপনাকে কত দুধ দেবো বাবু ? সপ্রতিভ টানা টানা চোখে হাসি উপচে পড়ে।

ফোঁস! করে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। দেখলাম অভিমানিনী অপমানিতা দুলালী ধীর মন্থর গতিতে বেরিয়ে গেল। ভুষোপড়া লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোতে সেই হতাশা-করুণ চেহারা চোখ এড়ালো না। কি অসহায় ছবি! সেদিনের চেয়েও করুণ, হাঁ, তার চেয়েও তীব্র···আমার আর্তকণ্ঠে চীৎকার করবার আগেই হি, হি করে উঠলো সীতারামিয়া! নেচে উঠলো একজোড়া পাকানো টাঙ্গি-গোঁফ। ঘুঁটে কুড়নী, ঘাস বেচুনীর দেমাক কত ?

জেনেশুনেও ওকে প্রশ্ন করি, ও, কে সীতারামিয়া ?

—ও এক দুধওয়ালী বাবু।

—দুধওয়ালী তোমার কাছে দুধ খুঁজছে কেন ?

—ওর গাই-ভঁইষগুলো মরে গেইল মারীতে, খুরয়াতে, ও মাসের আগের মাসে। সেই দুখে ওর মস্ত জুয়ান মরদটা কাঁথা নিয়েছে। অসাধ্যি রুগ। বাঁচবে না। বললাম ঘরে নিয়ে যা, ইখানে হাটালে বিটালে মরার···তা সিখানে সুবিস্তার 'দাওয়াই' নাই—ডাক্দর নাই···

—আর বৈজু মঙলী ?

গা-জ্বালানো তীক্ষ্ণ-ভয়ঙ্কর হাসি হেসে বললো,—বৈজু ওর ব্যাটা। মঙলী ওর যখের ধন বক্না বাছুর। সুহাগ দেখুন না! পেটে খেতে পায় না, বাছুরকে দুধ খাওয়ানো! নিজে বাঁচলে বাপের নাম। তাও বলি, কক্ডাক্টর গিরিধারীবাবুর মনে ধরেছে, ওর ঘরে চাকরাণী থাকগা গায়ে দু'খানা গহনা হইবে, খাবার পাবি, মরদটা দেখাবি, কত পাবি। তার দেমাক কত ? বলে লোক খারাপ, চারিত্তির ঠিক নাই—ঝি খাটবে না···

দুধ নাই, তাই দেখতে পাই না ওকে। তা' ছাড়া ওকে দেখবার আশা করি, কি ক'রে ? ওই ব্যবহারের পর ? সেদিনের সেই শিক্ষিত সভ্য মানুষদের নির্লজ্জ অপমান আর এই মূর্খ বুনো মোষটার অপমানের

পার্থক্য কোথায় ?

সেদিন। ফাগুনের সেই সকালে গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল। বেলা পর্যন্ত ঘুমানো অভ্যাস। তাই বিরক্তিতে চীৎকার করে উঠলাম, কি রে মেসে আজ হাট বসেছে নাকি? কাড়া নাকড়া বাজছে?

—ওরে ছোঁড়া কুম্ভকর্ণ, উঠেই ছাখ না মজাটা। হিমাংশু ওভার-সিয়ার বললে।

উঠতেই নজরে পড়লো ছুলালীরা বিষন্ন মুখখানি। আহা! কে যেন ওর সুন্দর মুখে একপোঁচ লজ্জার অপমানের কালি লেপে দিয়ে বোবা করেছে। যেন অশোকবনবাসিনী সীতা। তাকে ঘিরে মেসের মজা-দেখা মেম্বারগুলি। কানে ছেঁড়া ছেঁড়া কথা ঢুকছে।

—ছুধ খাচ্ছি না টাকা খাচ্ছি। টাকা সের ছুধ, তাতেও জল? ধর্মে সইবে? নামাবলী গায়ে দিয়ে সাধু সাজলে কি হবে, এখনও চাঁদ সুয্যি উঠছে।

হি, হি, হি! বাপরে বাপ। তখনি আমি বলিনি বাবা স্বভাব যায় না মলে, ইজ্জত যায় না ধুলে। গয়লারা ছুধে জল দেবে না? গয়লারা বলে ইজ্জত দিতে পারে, কিন্তু ছুধে জল দেওয়া ছাড়াতে পারে না······হি, হি, হি!

—বেড়ে বলছিস্ রে শ্যামাকান্ত। হো হো ক'রে হাসির ফোয়ারা উঠে।

যে শ্যামাকান্ত মহা কৃপণ, মিল-চার্জ বেশী পড়লে ছোটলোকের মত ঝগড়া করে, 'টু-পাইস্' যার ফাদার মাদর যে আমল পায় না বন্ধুদের কাছে, সে হঠাৎ আজ কলকে পেয়ে গেল। এবার ভ' দেখলি গরীবের কথা বাস হ'লে মিষ্টি লাগে। ছুধের চেয়ে অন্য কিছু খা······

এত সব যাকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছিল, সে নির্বিকার। দশচক্রে ভগবান ভূত, ও তো সামান্য গোপ বালিকা। ওর মনের অসহায় অবস্থা একটু বোঝবার চেষ্টা করলে এই মজা-পাওয়ার লোকগুলি কি এত কথা বলতে পারতো? ওই হাসির প্রতিমা থেকে কখন মিলিয়ে গিয়ে, এক করুণ বিপর্যয় চেহারা······সেকথা ঐ বেহায়া, ইতর,

স্বার্থপর পুরুষগুলো একবারও ভাবলে না। ওর নারীত্বকে বার বার লাঞ্ছিত করতে লাগলো, দুধে জল দেওয়ার দোহাই দিয়ে। ইন্সপেক্টরের হাতের ল্যাকটোমিটারে জল ধরা পড়েছিলো ঠিকই! কিন্তু এর ভেতরে যে সাজানো-ষড়যন্ত্র ছিলো, তা তো আর মিথ্যা নয়? পরে ত' বুঝে-ছিলাম কোন কোন নারীলোভী কুকুর প্রত্যাখ্যাত হয়ে দুলালীর অবর্তমানে তার দুধের কলস'তে জল ঢেলেছিলো। তারপর দু'একবার দেখা হয়েছে দূর থেকে, চোরের মত ছুটে পালিয়েছি লজ্জায়।

সম্বিত ফিরে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম সীতারামিয়াকে 'ও কোথা থাকে বলতে পার সীতারামিয়া?'

—ওই বাগানের দিকে, বাউরী ঘরগুলোর কাছে, শ্মশানকালীর মন্দিরের উত্তর পাশে ফুটো হোগলার ঘরটায়—ওই আলো জ্বলছে, রেড়ির তেলের···

আমি আর বাক্য ব্যয় না করে ছুটলাম। ওকে যে আমার অনেক কিছু বলবার আছে। ওর সঙ্গে দেখা করা দরকার, অন্তত একবার···

হোগলার পাতা ছাওয়া ঘরে পৌঁছতেই যে দৃশ্যটি চোখে পড়লো, তা আর ভুলবো না। ঘরের বাইরে সারি সারি গোঁজগুলো, শূন্য। এখনও দু'একটাতে দড়ি, পুরানো শুকনো ঘাস পড়ে—শ্মশানের ছেঁড়া কাঁথা বালিশের মতো। চুপি চুপি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম, ওই তো, ওই তো সব দেখাচ্ছে······

একটি শত ময়লা ছেঁড়াকাঁথায় শুয়ে এক কঙ্কালসার পুরুষ, মাঝে মাঝে কাশছে। কাশছে নয়, ধুঁকছে। রেড়ির তেলের নিবু-নিবু প্রদীপে ওর দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে যে মুখটি দেখা যায়, তার ত' এখন বিছানায় পড়ে দিন গুণবার কথা নয়। ও যে এখনও তিরিশ পেরোয়নি? ক্ষীণ আশার প্রদীপ জ্বেলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুকে হাত বুলাচ্ছে দুলালী। দু'দিকের খোলা দুটি বুকে ঝুলছে বৈজু, মঙলী। অসম্বৃত বেশ বাস, আলুথালু চুল। আর থেকে থেকে ওই মুখে বেরুচ্ছে করুণ আর্তনাদ! মঙলীর গায়ে তার মাথা ঘষে ওকে বোঝাচ্ছে, কিংবা নিয়তির পাষাণ পায়ে মাথা কুটছে কে জানে?

মণ্ডয়ী, মা আমার! আমি বড় অভাগিনী, কাঙালিনী! তুকে আজ দুধ দিতে পারলুম না, সারাদিন ঘাস কেটে, ঘুঁটে বিচে দেড় টাকা পেলুম—ভজুয়ার 'দাওয়াই' কিনতে গেল। বৈজু পাউডার খায়, কিন্তু তুই ঘাসও খেতে পারিস্ না, ভাল করে। কি ক'রে পারবি, তুর বয়স দু'মাসও লয়···আর চিল্লাস না বিজু, বুকে দুধ কুথা পাবি, আমি খেতে পাই যে দুধ পাবি, চুপ কর বাবা চুপ কর······

যেন পৃথিবীর সমস্ত দারিদ্র্য, বেদনা ওই অভাগিনীর ধূলিধূসর চেহারায় এলোমেলো রুক্ষ চুলে পরিস্ফুট···দুটি ধারা নেমেছে গালে—কেঁপে কেঁপে উঠছে ঠোঁট দুটো।

আর পারলাম না। দুধের জায়গাটা ঘরের ভিতর নামিয়ে ছুটে পালিয়ে এলাম। কোথা থেকে শাঁখের শব্দ, মেয়েদের হুলুধ্বনি ভেসে এলো। কোন পূজারী সত্যনারায়ণের পূজো শেষ করলেন। আমি দুধ নিয়ে গেলে বাড়ীতে সত্যনারায়ণের সিন্নি-ভোগ হবে, সে কথা একবারও মনে পড়লো না। গৃহিনীর মুখ ঝঙ্কারও না। আশ্চর্য!

আঁকাবাঁকা

অমর গঙ্গোপাধ্যায়

চলুন, সোজা বড় রাস্তাটা ধরেই চলা যাক। গোটা জীবনটা তো বাঁকাচোরা গলি ঘুঁজিতেই কেটে গেল। গল্পের খাতিরে আজ না হয় সোজা রাস্তা ধরেই চল্লাম। রোদ! হ্যাঁ দুপুরের চড়া রোদ গায়ে একটু লাগবে বৈকি। তা লাগুক। এঁদোগলির ড্যাম্প ধরা ঘরে থেকে থেকে শরীর মন দুই স্যাঁত স্যাঁতে হয়ে গেছে। আজ মনের চামড়ায় একটু রং ধরিয়ে নেওনা যাক। মশায় চাকরী করি বিল-কালেক্টরের। দুনিয়ার যতো প্যাঁচালো রাস্তায় আনাগোনা করতে হয়। আজ ছুটির দিন। তার ওপর বহুদিন বাদে দেখা হোল। চলুন না—গল্প করতে করতে সোজা এই বড় রাস্তাটা ধরে হাঁটা যাক।

সংসারের খবর আর জিগ্‌গেস কোরবো না। হাল সবারই সমান। স্ত্রীর অতি প্রজনন-জনিত রোগ। পুষ্টির অভাবে মেয়েটার ঘুষঘুষে জ্বর। ছেলের স্কুলের মাইনে বাকী সাত মাস। বড় ছেলে এম. এ. পাশ করে বেকার বসে আছে। আজ তেল নেই, কাল নুন নেই. ধুতি মাত্র দেড়খানা সম্বল। ঘরের ছাদ বেয়ে জল পড়ে। ভাড়া বাকী তিন মাসের। আর মাসের শেষে,—যাক। ওসব কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, সবই এক হাল। একটু এদিক ওদিক হবে হয়তো, কিন্তু মোদ্দা ব্যাপার এক। এদিক সামলালে ওদিকে গেরো।...একি! মোটর চাপা পড়বেন যে! দেখে চলুন, দেখে চলুন। ভাবতে ভাবতে পথ চলা ভীষণ বদ অভ্যাস। তা সে ভাবনা মেয়ের বিয়েরই হোক, আর নিজের জুতোরই হোক।—আচ্ছা, আমাদের সেই পুরোনো দিনগুলো আবার ফিরে আসতে পারে না? কলেজের সেই দিনগুলো,—যখন আমরা যেখানে সেখানে কারণে অকারণে পাগলের মতো হো হো করে হেসে উঠতে পারতাম। বেশ ছিলো সেই দিনগুলো। ওই বড়ো রাস্তার

মতো সোজা, কোলাহল মুখর। সবসময়ে মনে হোত সামনে আরো—আরো বড় কোন রাস্তা আছে।

বাসনাকে মনে পড়ে? ছিপছিপে ধরনের সেই সুন্দর মেয়েটা। টানাটানা চোখ দুটো যেন সব সময় স্বপ্ন দেখছে। মিষ্টি এক টুকরো হাসি যার কোন সময় শেষ হোত না। আপনারা তো ভাবতেন ওর সাথে আমার গভীর প্রেম। অবশ্য আমারো এমন একটা ধারণা ছিলো। আজো ওর কথা মনে হলে আমি বয়েস ভুলে যাই। বর্তমান ভুলে যাই। আলোয় আলোয় ঝিলমিলিয়ে ওঠা অতীতের কয়েকটা বিকেল তার অজস্র কথা আর অফুরন্ত হাসি নিয়ে আমাকে সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। নেহাৎ ভাবতে ভাবতে চলাটা রপ্ত হয়ে গেছে, তাই গাড়ী চাপা পড়ি না। পড়লে অবশ্য মন্দ হোত না। অনেক যন্ত্রণার একটা সহজ নিষ্পত্তি হয়ে যেত। আর ভালো লাগে না মশায়। কলেজ জীবনে ভাবতেও পারিনি বাইরের পৃথিবীটা পাঠ্য তালিকার চাইতেও এত কঠিন। দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে একটা মধুর কল্পনা ছিলো মশায়। কিন্তু গিন্নী আর কাচ্চাবাচ্চায় অনবদ্য কোরাসে,—যাকৃগে সে সব কথা। হা বলছিলাম। আমারো ধারণা ছিলো বাসনা আমাকে ভালোবাসতো। যৌবন কালটা একটা বিচ্ছিরী কাল। নেহাৎ বাচ্চা বয়সেও মানুষ এমন গবেট হয় না। এখন হলে ওকে এতো সহজে বিশ্বাস করতাম না। আমাকে স্রেফ বাঁদর নাচ নাচিয়েছে। এক জাতের মেয়ে আছে যারা নিজেদের আকর্ষণী ক্ষমতা সম্বন্ধে দারুণ সজাগ। ওরা নিজেদের মনোহারিত্বকে একের পর একজনের কাছে যাচাই করে চলে। অথচ কারো কাছে ধরা দেয় না। ধরা দেয় না বেটার চয়েসের লোভে। একজনকে জয় করে ভাবে, এ তো রইলই হাতের পাঁচ; এর চাইতে ভালো কারোকে পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক। আমি ছিলাম বাসনার হাতের পাঁচ। লেখাপড়ায় ভালো ছিলাম। দেখতেও নেহাৎ মন্দ ছিলাম না। উঁহু—এখন দেখলে কিছু বুঝতে পারবেন না। সংসারের ঘানিতে একবার টান পড়লে, আমাদের মতো কম দামী মানুষগুলো পাঁচ বছরে পঞ্চাশ বছরের মেক-

আপ নেয়।

বুঝলেন মশায়, এক বাসনার জন্য যা খরচ করেছি তা জমালে এতদিনে বড় মেয়েটার জন্য একটা ডি. এম, পাত্র জুটিয়ে ফেলতে পারতাম। কিনা করেছি ওর জন্য। দুবেলা ছাত্র পড়িয়েছি; বাবার পকেট কেটেছি। মায়ের আঁচল সাফ করেছি। শুধু ওর সিনেমা আর চকোলেটের জন্য। মেয়েটার সঙ্গে আলাপ এই চকোলেট নিয়েই। ক্লাসে ঢুকে একদিন দেখি ক্লাসে আর কেউ নেই। বাসনা একটা বেঞ্চে বসে একমনে চকোলেটের কাগজ খুলছে। আমাকে দেখে প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। তারপর লীলায়িত ভঙ্গিতে চকোলেটটি দাঁতে চেপে খোঁপা ঠিক করতে করতে বলে: প্রফেসর সেন আজ আসেন নি। চকোলেট খাবেন?···দিন, একটা বিড়ি দিন। কি বল্লেন? খান না। তা ভাল করেছেন। আমিতো মশায় পাগল হয়ে গেলাম। গিন্নী বাজারের সময় চারটি পয়সা দেন বিড়ির জন্য। কিন্তু ওতে ঠিক মানায় না। ভাত না খেয়ে দেখেছি। দু'এক বেলা চলে যায়। কিন্তু বিড়ি না হলে ভাত হজমই হয় না।

যা বলছিলাম, সেইদিন থেকে আমি হলাম বাসনার হাতের পাঁচ। পাখা গজাল। মনের সাধে উড়তে লাগলাম। বাসনার কটাক্ষে মিথ্যে হয়ে গেল বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সমাজ সংসার—এমনকি আমার সাধের এম, এ পড়াও। উড়তে লাগলো কলেজের মাইনে। ফিল্মষ্টাররা সব নিকট আত্মীয়ের মতো চেনা হয়ে গেল। আর নিকট আত্মীয়েরা হয়ে গেল ফিল্মষ্টারদের মতো বহুদূর। অনেক নতুন সিনেমা হল আর চকোলেটের দোকান চিনলাম। চিনলাম না শুধু বাসনাকে। কেদার অবশ্য আগেই সাবধান করেছিল। বলেছিল: যদি কাঁদতে না চাও তবে বাসনার সঙ্গে হাসাহাসিটা বন্ধ কর। তারপর আরো অনেক কিছুই বলেছিল। তখন বিশ্বাস করিনি। ভেবেছিলাম, এসব জেলাসীর বিষোদগার। আসলে বাসনার অভিনয়—অভিনয় বলবো না—বিশ্বাস করাবার ক্ষমতা ছিলো অশেষ। অবশ্য সেই সঙ্গে আমার গাধামোও ছিল অগাধ। কেদার একদিন স্পষ্ট দেখিয়ে দিল বাসনা

আর পিনাকী বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবে একটা ট্যাকসীতে চলেছে। তারপর অনেক বড় বড় হোটেলের নাম কোরলো যেখানে দু'একদিন রাত্রেও ওদের দেখা গেছে। কেদারকে চিনতাম। ও হতভাগা সকলকে নিজের স্তরে না আনতে পারলে শান্তি পায় না। ভাবলাম, বাসনা বোধহয় পিনাকীকে চেনে না। একদিন বাসনাকে সব খুলে বললাম। ও ভুবনমনোমোহিনী হাসি দিয়ে নিজেকে এমন রহস্যময় করে তুলনা যে পিনাকী-রহস্য চাপা পড়ে গেল। তবু তোতলাতে তোতলাতে বললাম: পিনাকীটা পাজীর পা ঝাড়া। বহু মেয়ের সর্বনাশ করেছে ও। বাসনা এক গাদা গরম নিশ্বাস আমার গালে ছেড়ে বললো: সব সর্বনাশ থেকে রক্ষা করার জন্য তুমি তো রয়েছ আমার পাশে।—পাঁঠার মতো ওকে বিশ্বাস করলাম। তার পরদিনই পিনাকীর টু' সিটারে ওকে বসে থাকতে দেখে ভাবলাম, আহা কি সরল মন।

ঐ যে রেষ্টুরেন্টটা দেখছেন, ঐ যে কোনায় নীল রংয়ের একটা টেবিল। ওখানে বসে কেদার একদিন কম করে সাতজনের নাম বলে গেল। সবাই নাকি বাসনাব পূর্ব প্রেমিক। কেদার আমার জন্য খেটেছে অনেক। এক ধরণের মানুষ আছে যারা গোপন সত্য আবিষ্কার করতে চায়। কিন্তু সে সত্য এমন হওয়া চাই, যাতে কোন মনে দারুণ আঘাত লাগে। ওর এই প্রকৃতি আমি জানতাম। তাই ওকে ষ্টুপিড বলে আলোচনা শেষ করতে চাইলাম। ও শুধু বললো: তোমাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, আগামী দু বছরে আরো তিনটি নাম দেব— যারা হবে তোমার পরবর্তী। গেলাম বাসনার কাছে। বললাম: বাজারে তোমার সম্বন্ধে এইসব গুজব ছড়াচ্ছে। বাসনার দুই চোখ জ্বলে উঠলো। দারুণ ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে ও বললো: আমি তো বাজার নই যে সেগুলো আবার আমার কাছে ছড়াতে এসেছো। মানুষের সঙ্গে হেসে কথা বললেই সেটা কিছু প্রেম নয়।

বাসনার এই উত্তর আমি আর একদিন শুনেছিলাম। এম, এ পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমি পরীক্ষা দিই নি; মাইনে বাকী বহুদিনের। পিনাকীও দেয়নি। কারণ ও মাইনে চালাতে পারবে বহুদিন। বাসনাও

দেয়নি ; কারণ বেটার চয়েসের জন্য ওকে এম, এ ক্লাসে থাকতে হবে আরো বহুদিন। বাসনাকে একদিন বিবাহের প্রস্তাব জানালাম। উত্তরে ও যেন বহুদূর থেকে বললো : মানুষের সঙ্গে হেসে কথা বললেই সেটা এমন কিছু প্রেম নয়। কয়েক দিন মুষড়ে পড়লাম। কেদার পিঠ চাপড়ে বললো : বেঁচে গেছ ব্রাদার, বাসনা কালনাগিনী।— সীতাপতিকে আপনার মনে আছে ? চির রোগা সেই কালো মতো ছেলেটা, যার আশ্চর্য রোমান্টিক মন পৃথিবীর সব কিছু সুন্দর দেখতো। ও হতভাগা বহুদূর থেকে বাসনাকে ভালোবাসতো। ও এসে বললো : সবাই ওকে ভুল বোঝে। আসলে ও নিজেও নিজেকে বোঝে না। ও জানে না ও কি চায়। তাই নতুন কোন ব্যক্তিত্ব দেখলেই ও এগিয়ে আসে। ভাবে, এতদিনে বোধহয় পেলাম। দুঃখ করো না। চেষ্টা করো যাতে ও সুখী হয়।—সীতাপতির আশ্চর্য উদারতা আমার মধ্যে কোন কালেই ছিলো না। তাই বাসনাকে ডেকে বললাম : আগুন নিয়ে খেলছো। যদি কোনদিন মুখ পোড়ে আমাকে ডেকো।

তারপর বাবার পেন্সন হোল। পড়া ছাড়লাম। মাঝে মাঝে ইউনিভার্সিটিতে যেতাম। দেখতাম পিনাকী বাসনা সকলের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। হঠাৎ একদিন শুনলাম কেদার প্লাস বাসনা। আশ্চর্য হলাম। দুঃখিত হলাম তারো বেশী। পিনাকা এসে বললো : মেয়েদের আর বিশ্বাস করিস না। ওরা চিরকাল বিশ্বাসঘাতক। কেদার এসে বললো : শুনেছিস সব। এবারে ঢিট করে দেব। বাঁদরামোর ওষুধ আমার কাছে আছে।—বুঝলাম এটুকুর কতকটা আমার জন্য আর পুরোটা ওর নিজের জন্য মেকী সান্ত্বনা। সীতাপতি এসে বললো : এতদিনে বাসনা বোধহয় মনের মানুষ পেয়েছে।

কেদারকে তো দেখেছেন। সুন্দর গ্রীক ফিগার। চোখে বুদ্ধি পৌরুষ। মুখে শেষের কবিতার অলিখিত ডায়লগ। বাপের অজস্র টাকা। কাছে কেদারের স্থান ছিল সকলের ওপরে। আমার সঙ্গে যখন ওর ঘনিষ্ঠতা ছিলো তখন ওর নিন্দার কথাগুলো বলে যখন

বলতাম কেদার বলেছে—তখন বাসনা অল্প একটু হেসে বলতো : ওটা একটা পাগল। বাসনা কেদারকেই ভালবাসতো। তারপর ওদের বিয়ে হোল! চমকে উঠলেন যে! সত্যিই ওদের বিয়ে হোল। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। সাক্ষী ছিলাম আমি আর সীতাপতি। কয়েকটা বছর ওদের সুখেই কেটেছিল। ওদের বাড়ীতেই প্রায়ই যেতাম। বধূবেশে বাসনা অনেক স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। অমন স্মার্ট মেয়েটার মধ্যেও বধূর সরম রঙীন হয়ে উঠেছিল। চোখের দৃষ্টিতে সন্ধান-চাঞ্চল্য শেষ হয়ে নামলো আশ্রয়ের গভীরতা। বেশ বড়ো করে সিঁদুরের টিপ পরতো বাসনা। সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার—ও খেতে বসতো কেদারের খাওয়া হয়ে গেলে। ওর ওই আনন্দময়ী মূর্তি দেখে পুরোনো সব বঞ্চনা ভুলে গেলাম। সীতাপতিকে দেখতাম আনন্দে ঝলমল করছে। আমরা কয়েকজন বন্ধু সন্ধ্যের পরে মিলতাম বাসনাদের বাড়ীতে। বেশ কাটছিলো দিনগুলো। বাসনার বল্গাহীন উদ্দাম অতীত সংযত গৃহকর্ত্রীর মধ্যে সুন্দরতর হয়ে উঠেছিল। সীতাপতি বলতো : দেখে নাও সত্যিকারের বাসনাকে। বেশ কাটছিলো দিনগুলো। হয়তো এই-ভাবেই কেটে যেত। কিন্তু—বাসনা একদিন উধাও হোল।

ব্যাপারটা খুলেই বলি। না হলে সব বোঝা যাবে না। কেদারের সহজ জীবনের তলায় তলায় ভাঙন ধরেছিল। তীব্র সন্দেহ ওকে পাগল করে তুললো। একদিন বাসনার বিরুদ্ধে যতো কাহিনী ও জড়ো করেছিল—সব কাহিনী ওকে ভেতরে ভেতরে বিষাক্ত করে তুললো। আকারে ইংগিতে আমাদের আসতে বারণ করলো। কারণে অকারণে বাসনার চলাফেলার ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে লাগলো। প্রথমে বাসনা বুঝতে পারেনি। যেদিন বুঝতে পারলো সেদিন আর সময় নেই। বাসনা তখন অন্তঃসত্ত্বা। বারণ সত্ত্বেও খবর নেবার জন্য একদিন ঢুকে পড়লাম ওদের বাড়ীতে। সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, এমন সময় শুনতে পেলাম বাসনার তীক্ষ্ণ চাপা স্বর : তুমি ইতর, জঘন্য ইতর তোমার মন। তারপর রাগে ফেটে পড়া কেদারের কণ্ঠ : আমি জানতে চাই তোমার সন্তানের পিতৃত্ব কোন ভাগ্যবানের……। চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি নেমে

আসবার চেষ্টা করলাম। বাসনা ততক্ষণে ঘরের বাইরে এসে গেছে। আমার দিকে তাকিয়ে ও যেন কি বলতে চাইলো। তারপর কোন কথা না বলে একেবারে পথে নেমে গেল।

তারপর পৃথিবী দশবার সূর্য প্রদক্ষিণ সেরে এসেছে। কেদার দিনে দিনে মদের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। দশ বছরে ওর প্রায় সকল সম্পত্তি কিনে নিয়েছে পিনাকী। সীতাপতি বিয়ে করেনি। আমার বিয়ে হয়েছে। পাঁচটি সন্তান হয়েছে। পৃথিবীর বয়স বেড়েছে দশ বছর। আমাদের বেড়েছে পঁচিশ বছর। বাসনার কোন খবর আর পাইনি। আজ হঠাৎ ওর একটা চিঠি পেলাম। লিখেছে : দীর্ঘ দশ বছর জীবনের অনেক বাঁকা চোরা পথে ঘুরে বেড়ালাম। নামলাম অনেক নীচে। দেখলাম আরো নীচে নামা। জীবনের সহজ পথ যেখানে বেঁকে দুমড়ে এসে শেষ হয়েছে এক কানাগলিতে, সেখানে কাটালাম টানা দশ বছর। বি, এ সার্টিফিকেটের দাম মাসে সত্তর টাকা। কিন্তু মেয়েদের দাম বোধহয় তার চাইতে অনেক কম। মানুষের মনের বিষ থেকে রক্ষা পাবার জন্য একদিন ঘরের বার হয়েছিলাম। তারপর শুধু বিষ আর বিষ। বিশ্বাস করো, দুই হাতে ঢেউ সরিয়েছি আমি। লোভের ঢেউ। লালসার ঢেউ। নিজেকে অমূল্য সম্পদ ভেবে পৃথিবী জয়ের স্পর্ধা ছিলো আমার। তোমাদের মধ্যে আমার দর যাচাইয়ে ভুল ছিলো। আজ বুঝেছি। আমার দাম কানাকড়িও নয়। পৃথিবী জয়ের মোহ ভেঙেছে বহুদিন। কেদারকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিলাম, জীবনের সব পাওয়া বোধহয় পেয়ে গেলাম। কিছু পাওনা বাকী ছিলো। দশ বছরের দুঃসহ জ্বালায় সে পাওনাও শেষ হয়ে এসেছে। জীবন এখানে বিষাক্ত ; মানুষ এখানে ধুঁকতে ধুঁকতে পথ চলে। অথচ এই তীব্র বিষাক্ত আবহাওয়ায় কেদারের ছেলেটা আজো বেঁচে আছে। আশ্চর্য ওর জীবনীশক্তি। জীবন যেখানে আপনি দুমড়ে বেঁকে শুকিয়ে ঝরে যায়, সেখানেও বিদ্রোহী বটশিশুর মতো অপূর্ব স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে আছে। আমি আজ মরনাপন্ন। জীবনের সব দেনা-পাওনার বাইরে যাবার ডাক এসেছে। মানুষকে আমি চিনতে পারিনি। অনেক মানুষ আমাকে

চিনতে পারেনি। জীবনের শেষ সময়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম কেদারের দস্যি ছেলেটা আমাকে মা বলে চিনতে পেরেছে। আরো আশ্চর্য—ভাবতে পারো, তোমাদের ভাষায় "বন্ধনহীন বাসনা" জীবনের শেষ দশটা বছরে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে ঐ ছোট্ট ছেলেটার সকল অধিকার। আমি ছাড়া ওর কেউ নেই। আমি আজ মরনাপন্ন। কিন্তু মরার আগে ওকে একটা সহজ পথ দিয়ে যেতে চাই। একবার এসো, কেদারের এই ছেলেটাকে বনের এই বাঁকা চোরা কানাগলি থেকে একেবারে সোজা বড় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দাও। ওর মায়ের গ্লানি যেন ওকে স্পর্শ না করে। ওর বাবার নীচতা যেন ওকে স্পর্শ না করে। একদিন বলেছিলে, আগুন নিয়ে খেলতে গিয়ে যদি মুখ পোড়ে সেদিন যেন তোমাকে ডাকি। মুখ পুড়েছে বহুদিন, ডাকতে পারিনি অভিমানে। আজ ডাক পাঠালাম অন্য কারণে। যদি না আস তবে শুধু মুখ নয়—দশ বছরের গোটা একটা জীবন জ্বলে পুড়ে ছাই ছাই হয়ে যাবে। কেদারের ছেলেটাকে তুমি নিয়ে যাও। ও জানে না ওর বাবা কে। দরকার হলে তোমার ছেলে বলে পরিচয় দিও। তবু বলো না কেদার ওর বাবা।

বুঝলেন, যৌবনের কোন দুর্বল মুহূর্তে ওকে কি বলেছিলাম; সেই ভরসায় ও আমাকে ডেকেছে দশ বছরের একটি নিষ্পাপ শিশুর পিতৃত্ব নেবার জন্য। একবারও ভাবলো না আমার গিন্নী এই পিতৃত্বকে কি নিদারুণ অভ্যর্থনা করবেন। সীতাপতিকে লিখে দিয়েছি আসতে। ওর সরল মন আজো পৃথিবীর সব কিছুকে সুন্দর দেখে। এই দশ বছরে বয়েস বাড়েনি একমাত্র সীতাপতির। ওকে আসতে লিখে দিয়েছি।

কি বলেন? সোজা রাস্তা ছেড়ে এই কানাগলিতে ঢুকলাম কেন? বাসনা যে এই গলিতেই থাকে।

সমাপ্ত